স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

৬৬ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা ।।
১১ আগস্ট - ২০১৪ ।।
২৫ শ্রাবণ - ১৪২১ ।।
website : www.eswastika.com

অখণ্ড ভারত ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

দলত্যাগী ছয় বিধায়কের কাছ থেকে নির্বাচন কমিশন পদত্যাগ পত্র চাইলে রাজ্যে আটটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : অন্তরাত্মার খোঁজে বই লিখছেন ম্যাডাম □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে মোদী সরকারের কৌশলগত পদক্ষেপ □ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় □ ১২

অখণ্ড ভারতের প্রাসঙ্গিকতা □ ড. ভাস্কর পুরকায়স্থ □ ১৪

অনুপ্রবেশ বন্ধ না হলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে □ মোহিত রায় □ ১৬

শ্রীঅরবিন্দের মহাসমন্বয় □ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী □ ১৮

দ্রাবিড় এবং তামিল নামগুলি মূলত সংস্কৃত □ রাজকুমার জাজোদিয়া □ ২০

রাঢ় বাংলার প্রাচীন শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যে বিষ্ণুপুর □ প্রশান্ত কুমার মণ্ডল □ ২১

জাপান-ভারত যৌথ উদ্যোগে দেশের ক্ষতি নেই □ অভিজিৎ ভট্টাচার্য □ ২৭

গ্রাম, বর্ষা, বাজপড়া, সাপে কাটা ও সরকার □ প্রবীর ঘোষ □ ২৯

ইরাক : ইসলামের ভ্রাতৃত্ববন্ধন সোনার পাথরবাটি □ নীতিন রায় □ ৩০

অশোকস্তম্ভের উৎপত্তি □ সৌমেন নিয়োগী □ ৩১

মধ্য ও নিম্নবিত্তদের উচ্ছেদে কলকাতা পুরসভা □ দেবাংশু ঘোড়ই □ ৩৭

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ - ১৪-১৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অঙ্গনা : ২৬ □ অন্যরকম : ৩৩ □ সুস্বাস্থ্য : ৩৫ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬ □ খেলার জগৎ : ৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০ □

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা, ২৫ শ্রাবণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৬, ১১ আগস্ট - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৮ আগস্ট ২০১৪

প্রকাশিত হবে ১৮ আগস্ট ২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জন্মাষ্টমী ও সজ্জন সমাজের ভূমিকা

পুণ্য জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৭ বৎসরে পদার্পণ করছে। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সৎ লোকদের পরিত্রাণের জন্য তিনি বার বার আবির্ভূত হবেন। আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে সজ্জন সমাজের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য , মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলি, অম্লানকুসুম ঘোষ প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেপাল সফর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দুই দিনের নেপাল সফর ভারতের নিকট প্রতিবেশী দেশগুলির প্রতি তাঁহার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আরও একবার স্পষ্ট করিল। প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণের পর বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে ভুটানকে প্রথম পছন্দের দেশ হিসাবে তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরালের নেপাল সফরের ১৭ বৎসর পর তিনিই প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি নেপাল সফরে যাইলেন। ভারত-নেপাল সম্পর্ক নূতন করিয়া ঝালাইয়া লইবার ক্ষেত্রে ইহা একটি ঐতিহাসিক সুযোগও বটে। কেননা নেপাল এখন রাজতন্ত্রের অবসানের পর নূতন করিয়া নিজেদের সংবিধান রচনা করিতেছে। দুই দেশের মধ্যে গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধন। ভারতের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত নেপালের রাজপরিবার তো বটেই, অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক রহিয়াছে। এই দেশের মানুষের একবার অন্তত পশুপতিনাথ দর্শন না করিলে যেমন জীবন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তেমনই নেপালের মানুষেরও ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শন না করিলে মনোবাসনা পূর্ণ হয় না। ইহা সত্ত্বেও গত কয়েক বছরে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জেরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। মোদীর এই সফর সেই শিথিল বন্ধন অনেকটাই দৃঢ় করিয়াছে।

মোদী খুব স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন, নেপালে এখন যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিবর্তন হইতেছে তাহা তাহাদের নিজস্ব ব্যাপার। ভারত এই বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। বরং তাহাকে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক উন্নয়নের সমান অংশীদার হইতে সহায়তা করিবে। এই উদারতাই নেপাল ও অন্য সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে আপন করিবার ক্ষেত্রে স্তম্ভস্বরূপ। ভারতের সম্পর্কে দাদাগিরি সুলভ আচরণের যে ধারণা তাহাদের আছে, তাহা দূরীভূত হইবে।

সম্প্রতি ব্রিকস এবং সার্কদেশগুলির মধ্যেও একটি সহযোগিতার সেতু বন্ধন সম্ভব হইয়াছে। ব্রিকস দেশগুলি যে ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে চলিয়াছে তাহাতে লাভ হইবে নেপালেরও। কারণ এই ব্রিকস বৈঠকের বক্তৃতায় একমাত্র নরেন্দ্র মোদীই বলিয়াছেন, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করিবার কথা। গুরুত্ব দিয়াছেন গৃহহীনের জন্য গৃহ, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা এবং দূষণবিহীন বিদ্যুৎ শক্তির উপর। নেপালের উপর চীনের লক্ষ্য বহুদিনের। নেপালকে কব্জা করিয়া ভারতকে জব্দ করিবার বিষয়ে তাহাদের কৌশলের অন্ত নাই। চীনের মদতেই নেপালে কিছুদিন কমিউনিস্ট শাসনও শুরু হইয়াছিল, কিন্তু এককালের হিন্দুরাষ্ট্র নেপাল তাহার দেশের মানুষের হৃদয়ে কমিউনিজম স্থান পায় নাই। পরিত্যাজ্য হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর এই সফর সেই অর্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যদিও এই সফরে মূলত অর্থনীতির উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে; তবুও সন্ত্রাসবাদ, জালনোট পাচার ইত্যাদি বিষয়গুলি থাকিয়াছে। নেপালের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে দুই দেশ উদ্যোগ লইলে দুই দেশই লাভবান হইবে। ভারত মনে করে ভেষজ দ্রব্যের শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে নেপালের স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। ভারতকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়াও নেপাল উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। এককথায় মোদীর এই নেপাল সফর বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করিয়াছে।

সুভাষিত

চলৎচিত্তং চলৎবিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি।।

মন, ধন-সম্পত্তি, জীবন ও যৌবন সবই জগতে চঞ্চল অবস্থায় থাকে। কেবল যাঁর কীর্তি আছে, তিনিই জীবিত থাকেন।

পাঁচ হাজারের বেশি বাংলাদেশের হিন্দুদের পুনর্বাসন দিল মধ্যপ্রদেশ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশের হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় খোদ পশ্চিমবঙ্গও যা করে দেখাতে পারেনি, তাই করে দেখাল মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার। গত ৩০ জুলাই দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে দেওয়া এক হলফনামায় শিবরাজ সিং চৌহ্বান সরকার জানিয়েছে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে তারা। শুধু তাই নয়, তাদের নাগরিকত্বের পরিচয় প্রদানের পাশাপাশি রেশন কার্ড, এমনকী কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। সূত্রের খবর, রাজ্যের পাঁচটি জেলায় এঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রদেশ সরকার সুপ্রিম কোর্টে এই কথা জানায়। 'স্বজন' নামক ওই সংস্থাটি সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছিল যে অসম-সহ ভারতের অন্য রাজ্যগুলি বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে উৎখাত হয়ে আসা হিন্দুদের যাতে কোনোভাবেই বিতাড়িত করতে না পারে সেই

শিবরাজ সিং চৌহ্বান

আদেশ জারি করতে। তবে মধ্যপ্রদেশ সরকারের এই প্রয়াস সামগ্রিকভাবে বিজেপি-র নীতির প্রতিফলন বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। সাম্প্রতিকতম লোকসভা নির্বাচনের আগে ভোটের প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী বিষয়টির সবিস্তার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, মৌলবাদীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেদের জীবন, মান-মর্যাদা ও সম্পত্তি বাঁচাতে বাংলাদেশের 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু'রা (যাঁদের সিংহভাগই হিন্দু) এদেশের আশ্রয়প্রার্থী হলে ভারতকে তাঁদের 'শরণার্থী' আখ্যা দিয়ে আশ্রয় দিতে হবে। কিন্তু এদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ভাগ বসাতে বাংলাদেশের 'ধর্মীয় সংখ্যাগুরু' অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো মানুষ কাঁটাতারের বেড়া টপকে ভারতের আশ্রয়প্রার্থী হলে তাদের 'অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে বিবেচনা করে তাদের বিতাড়ন করা হবে। এই প্রাক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মুসলমান ভোট লোভী রাজনীতিকদের অশ্রাব্য কটু-কাটব্যের মধ্যে পড়তে হয় মোদীকে। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য যে কথার কথা ছিল না মধ্যপ্রদেশ সরকারের এহেন পদক্ষেপই তার প্রমাণ বলে মনে করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হলফনামায় মধ্যপ্রদেশ সরকারের বয়ান অনুযায়ী ৫৪৬৪ জন বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে তারা। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে এঁদের নিয়োগেরও ব্যবস্থা হচ্ছে। কেউ স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করতে চাইলে তাতেও অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের বিকল্পও রেখেছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। এনিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি যা একদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, অন্যদিকে মানবিক ও নৈতিক কর্তব্য পালনের উপযোগী বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল, যার সার্থক প্রতিফলন মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ সিং চৌহ্বানের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের এই কাজে দেখা গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় 'স্বজন' আদালতের কাছে এই আদেশই শুনতে চেয়েছে যাতে কেন্দ্র ও প্রতিটি রাজ্যই বাংলাদেশের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করে। এনডিএ-র পরিচালনাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি তার জোটসঙ্গীদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজ্য সরকারগুলো এ ব্যাপারে সক্রিয় হলেও, অন্যান্য রাজ্য মুসলমান ভোটের তাগিদে এ ব্যাপারে কতটা সক্রিয় হয় বা আদৌ হয় কিনা, তাই এখন দেখার।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তীর্থযাত্রা বাতিল করল জম্মু-কাশ্মীর সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জম্মু-কাশ্মীর সরকার কাশ্মীরি পণ্ডিতদের দেওয়া কৌসরনাগ যাত্রার অনুমতি ফিরিয়ে নিয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নেতা সৈয়দ আলি গিলানির হুমকিতেই সরকারের এই পদক্ষেপ। কাশ্মীর উপত্যকার সোপিয়ান জেলায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় কৌসরনাগ হ্রদ। হিন্দুদের কাছে এটি তীর্থক্ষেত্র। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের অল পার্টিস মাইগ্রেন্টস কো-অর্ডিনেসন কমিটি সম্প্রতি এই যাত্রার আয়োজন করে। কাশ্মীরি হিন্দুদের আগামী ৬ আগস্ট সেখানে পৌঁছে ছ'দিন ধরে পূজাপাঠ করার কথা ছিল। উপত্যকার মধ্যে এই হ্রদই সবচেয়ে পবিত্র বলে মনে করা হয়। রাজ্য সরকারও এই হ্রদের স্থানটিকে ধর্মীয় তীর্থক্ষেত্র বলে ঘোষণা করে এবং তীর্থযাত্রা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। গিলানির বক্তব্য, উপত্যকার মুসলিম পরিচিতিকে ম্লান করতে এটা নাকি আর এস এসের ষড়যন্ত্র। গিলানি আরও বলেছেন, ইজরায়েল প্যালেস্তাইনের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করেছে ভারতও কাশ্মীর উপত্যকায় একই ধরনের নীতি প্রয়োগ করতে চায়।

সংবাদ প্রতিবেদন

প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলি আক্রমণের প্রেক্ষিতে ভারতের ভূমিকার প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতে নিযুক্ত প্যালেস্টানিয় রাষ্ট্রদূত সালে ফিয়েদ মহম্মদ অকপটে জানালেন যে 'গাজায়' ইজরায়েলি বোমা-বর্ষণের বিরুদ্ধে ভারত নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ না করায় যে গেল গেল রব উঠেছে তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। ভারতের নিরপেক্ষ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে রাষ্ট্রদূত জানান, পৃথিবীর প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশেরই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীন বিদেশ নীতি থাকার অধিকার আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হলে যে-কোনো দেশেরই স্বাধীন বিদেশনীতি সেই দেশের দীর্ঘকালীন কূটনৈতিক সম্পর্কের রূপরেখার নির্দেশ দেয়। এগুলি হঠাৎ করে নেওয়ার মতো কোনো সিদ্ধান্ত নয়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশ কি প্রতিক্রিয়া দিল না দিল তা পর্যালোচনায় না এনে বা আমাদের দেশের পূর্বাপর আরব দেশ ও ইজরায়েলের ক্ষেত্রে অবস্থান কি তা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ভোট জোটাতে কলকাতা বা মেদিনীপুরে সিপিএম দলের মিছিল বের করার মতো ব্যাপার যে এটা নয় প্যালেস্টানিয় রাজদূতের এই চাঁছাছোলা প্রতিক্রিয়া তা বুঝিয়ে দিল।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক কেরল সফরের প্রাক্কালে তিনি বলেন, প্যালেস্টানিয়দের জন্য যে ভারতের দীর্ঘকালীন আন্তরিক সমর্থন রয়েছে তা অতীতে 'জেনিভা সম্মেলনের' সময় ভারতের প্যালেস্টানিয়দের পক্ষ নেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভারত তাদের সেই অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেনি। এই বিষয়ে তাই ভারতের সঙ্গে আমাদের তিলমাত্র মতভেদ বা ক্ষোভ নেই। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত জানান আমরা কখনই বলতে পারি না গাজায় সাম্প্রতিক ঘটনাবলির সুবাদে ভারতের ভূমিকায় কোনো পরিবর্তন হয়েছে। দেশের নতুন বিজেপি সরকারের উল্লেখ করে তিনি জানান, এই সরকার সদ্য এসেছে। এদের কাজকর্ম ও বিচারধারা পর্যালোচনা করার সময় এখনও মোটেই আসেনি। প্যালেস্টাইন ভারতের কাছে দেশের উন্নতিতে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ায় সূত্রে ঐতিহাসিক ভাবে দায়বদ্ধ। এই মর্মে তিনি বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের সদর্থক ভূমিকার উল্লেখ করে বলেন যে ভারত বিশেষ করে প্যালেস্টাইনের ক্ষেত্রে সর্বদাই তার পাশে থেকেছে। আন্তর্জাতিক আঙিনায় উভয় দেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে তাঁরা সবরকমের প্রচেষ্টাকেই স্বাগত জানাবেন।

এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূতকে আরব দেশগুলির নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "একজন রোগী কখনই আর একজন রোগীর সাহায্যে আসতে পারে না।" তিনি ইরাক, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি আরব দেশগুলির অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদের উপস্থিতির উল্লেখ করেন। দীর্ঘস্থায়ী মৌলবাদী সন্ত্রাস তাদের অস্তিত্বকে এতটাই বিপন্ন করে তুলছে তারা আর অন্য কারুর দিকে নজর দেওয়ার অবকাশই পাচ্ছে না। আরব দুনিয়ায় চূড়ান্ত মৌলবাদী উত্থানের পটভূমিকার সুযোগ নিয়েই ইজরায়েল আজ গাজাকে অনায়াসে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছে। অথচ মৌলবাদী 'হামাস'কে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা প্যালেস্টানিয় সরকারের নেই। আজ সন্ত্রাসী হামাসরাই প্যালেস্টাইনের মুখ হয়ে উঠছে।

ক্যাগের চাঞ্চল্যকর তথ্য

৪.৬ কোটি সিমকার্ড ব্যবহারকারীর পরিচয়ই অজানা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত পয়লা আগস্ট সংসদে পেশ করা ক্যাগ রিপোর্টে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। কম্প্রটোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি বা ক্যাগ) তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, বর্তমানে প্রায় ৪.৬ কোটি মোবাইল সিমকার্ড ব্যবহারকারীর পরিচয় অজানা। ২০০৮ সালের সরকারি নির্দেশনামা অনুযায়ী প্রত্যেকে সিমকার্ড ব্যবহারকারীর বিস্তারিত পরিচয় মোবাইল সংস্থাগুলির কাছে থাকা আবশ্যিক। কারণ পরিচয় গোপন করে মোবাইলের সিম ব্যবহার করে ফোনে ভীতিপ্রদর্শন থেকে নানান অপরাধমূলক কাজকর্ম করা, মায় সন্ত্রাসবাদী হুমকি অবধি দেওয়ার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছিল তা রোধ করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল বছর ছয়েক আগেও। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝেও মোবাইল সংস্থাগুলির এই উদাসীনতা তাই তথ্যাভিজ্ঞমহলের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। সিমকার্ড ব্যবহারকারীদের পরিচয় তথ্যাদি না জানার জন্য সাতটি প্রধান টেলিকম কোম্পানিকে ৪,২০০ কোটি টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। যদিও আদায় হয়েছে মাত্র ৪০০ কোটি টাকা। ক্যাগ রিপোর্ট এও বলছে, এই ধরনের 'অমান্যতা'র শতাংশ ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ৪ থেকে ৫৪ পর্যন্ত ছিল। এ ব্যাপারে একেবারে প্রথমেই রয়েছে রিলায়েন্স কমিউনিকেশন লিমিটেডের নাম। তাদের ৯১৮ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ৯১.৮৩ লক্ষ বিভ্রান্তিকর কাস্টমার অ্যাকুইজিশন ফর্ম (সি এ এফ) ভর্তি করার জন্য। এই হিসেবে ২০১২ সাল পর্যন্ত। প্রসঙ্গত এই সি এ এফ-তে গ্রাহকদের পরিচয় ও ঠিকানা প্রমাণাদি থাকে। এ নিয়ে গাফিলতির জন্য ভারতীয় এয়ারটেলের জরিমানার পরিমাণ ৯০৬ কোটি টাকা, ভোডাফোনের ৬০১ কোটি টাকা এবং টাটা টেলিসার্ভিস লিমিটেডের ৪০৮ কোটি টাকা। ২০০৬ সালে টেলিকম দপ্তর পূর্ব-সক্রিয় সিমের বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেয়।

গ্রাহকের পরিচয়-ঠিকানা যাচাই করার পর সিম সক্রিয় করার প্রক্রিয়া চালু হয় তখনই। কিন্তু নজরদারির অভাবে এই প্রক্রিয়ার সুফল আপাতত সুদূরপরাহত।

সংবাদ প্রতিবেদন

মাও-যোগাযোগের অভিযোগে কেরলে গ্রেপ্তার সুইস নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৮ জুলাই কেরলের থ্রিপ্রেয়ার অঞ্চল থেকে মাওবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার অভিযোগে জোনাথন বোল্ড নামে এক সুইস নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত জুনে বোমা তৈরি করতে গিয়ে নিহত এক মাওবাদীর স্মরণসভায় যোগ দিতে গিয়ে ত্রিচুর জেলার ভালাপাড থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সে। পুলিশের বক্তব্য, তল্লাশী চালিয়ে তার ঘর থেকে মাওবাদীদের প্রচারের বহু কাগজ-পত্র পাওয়া গিয়েছে। জেরার মুখে স্বীকারও করে নিয়েছে যে, সে মাওবাদী-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। গত ১০ জুলাই বোল্ড ভ্যালেরি সিলেনি নামে এক মহিলার সঙ্গে উত্তর কেরলের কান্নুরে আসে পর্যটক ভিসায়। এরপর কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে গত ২৮ জুলাই থিপ্রেয়ারে মাওবাদীদের স্মরণসভায় পৌঁছোয়। সেখানে আরও চল্লিশজন মাও নেতা উপস্থিত ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ভিসা আইন ভাঙার অপরাধে বিদেশি আইনের ১৪বি ধারায় ভালাপাড পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারির মুহূর্তে বোল্ডের কাছে পাসপোর্ট ছিল না। পরে কান্নুরে তার হোটেলের ঘর থেকে পাসপোর্ট উদ্ধার করে পুলিশ।

মাওবাদীদের প্রতি নিজেকে সহানুভূতিশীল বলে দাবি করলেও, এদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই বলেও পুলিশকে জানিয়েছে সে। তার দাবি, ইতিহাসের গবেষণার কাজেই ভারতে আসা। কিন্তু জোনাথনের এই দাবিকে পাত্তা দিচ্ছে না পুলিশ। কারণ এই অল্প ক'দিন ভারতে থাকার সুযোগেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের মধ্যে দেশবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার ব্যাপারে সে যে সচেষ্ট হয় এমন তথ্যও পুলিশের হাতে এসেছে। জানা গিয়েছে, গত ২৪ জুলাই কোঝিকড়ে সিপিএমের উদ্যোগে আয়োজিত 'গাজা সংহতি' বৈঠকে সে নিজেকে ফ্রান্স থেকে আসা ম্যাথু বলে পরিচয় দিয়েছিল। পরের দিন সিপিএমের মুখপত্র 'দেশভিমানী ডেইলি'তে যে বিদেশির সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তার দাবি ছিল যে ফ্রান্সে বিভিন্ন অতি-বামপন্থী গোষ্ঠীর একজন সক্রিয় কর্মী সে। তার সঙ্গে আসা ভ্যালেরি সিলেনি নামক মহিলাটিকে সে সেখানে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়। ওই মহিলা নিজেকে জার্মান নাগরিক, নাম মার্টিনা বলে পরিচিত করায়।

নাম ও পরিচয় ভাঁড়ানোর আসল উদ্দেশ্য কি তা বুঝতেই আপাতত গলদঘর্ম পুলিশের। তবে মাওবাদীদের সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রের যোগাযোগ ইতিপূর্বে বহুবারই প্রমাণিত হয়েছে। এটি তারই অঙ্গ বলে মনে করছেন অনেকেই।

স্বস্তিকা

অমিত শাহ বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশিত হবে আগামী ২৫ আগস্ট, ২০১৪

সম্প্রতি বিজেপি-র জাতীয় পরিষদের বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে অমিত শাহ-এর নামে সিলমোহর লাগানো হলো। ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি-কে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি যে মুখ্য কারিগর তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। এবারে তাই প্রচ্ছদ নিবন্ধ—অমিত শাহ।

দাম একই থাকছে - ১০ টাকা

।। সত্বর কপি বুক করুন।।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company

'Park Plaza'

71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016

98311 85740/9831272657–

emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

দেশ জুড়ে কংগ্রেসের ভাঙন কি প্লেগের চেহারা নিচ্ছে?

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়॥ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গ্রাম শহরে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে নগর বা গ্রামবাসী চট্‌জলদি লোটা কম্বল নিয়ে সেই আক্রান্ত অঞ্চল ত্যাগ করত। শোনা যায় যারা পড়ে থাকত এই মারণরোগ তাদের কাউকেই ছাড়ত না। এই রোগের প্রকোপ কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অচিরেই দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ত।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই মোদীর উত্থানের সম্ভাব্য সম্ভাবনার আন্দাজে বহু কংগ্রেসী রথী-মহারথী, কুঁচোকাঁচা অনেকেই পরিবারতন্ত্রের প্লেগাক্রান্ত কংগ্রেসের আসন্ন দুর্দশার অনুমান করে দলত্যাগের সুলুক সন্ধান করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত হওয়ার পরও দলকে হতবাক করে দিয়ে হাওয়া বুঝে এক কংগ্রেসী বিজেপি-তে চলে যান। উত্তরপ্রদেশের ডোমরিয়াগঞ্জের অতি প্রবীণ রাজনৈতিক-নাড়িজ্ঞান সম্পন্ন নেতা জগদম্বিকা পাল তুরন্ত দলত্যাগ করে বিজেপি সাংসদ হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। এমন উদাহরণ সংখ্যায় মোটেই কম নয়। তবে সেটা ছিল ভোট বাজার। তখন কিছুটা উথাল-পাথাল খুব অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু মোদীর শপথ-পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস দলের দুঃস্বপ্ন সফল করে সেখানে প্রায় মড়ক লেগে গেছে। সংবাদে প্রকাশ, অসমের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর বিরোধিতা করে প্রভাবশালী শিক্ষামন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা পদত্যাগ করেছেন। অসম কংগ্রেস দলের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা চলেছে। হাইকম্যান্ডের পক্ষে গগৈ-এর নেতৃত্বে কোনো পরিবর্তন না হওয়ার সঙ্কেত পাওয়া মাত্রই এই গোলযোগ ঝড়ের আকার নেয়। বিশ্বশর্মা তাঁর অনুগামী ২৮ জন বিধায়কদের নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে রাজ্য রাজ্যনীতির ভবিষ্যৎ অস্থিরতার আগাম আঁচ দিয়ে রাখলেন। প্রসঙ্গত তরুণ গগৈ যে গান্ধী পরিবারের বরাবরের কৃপাধন্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিবারবাদের ধামাধরা রক্ষকদের বিরুদ্ধেই কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় সংঘাত ভারতব্যাপী দানা বাঁধছে। মহারাষ্ট্রে ২০০৫ থেকে শিবসেনা ছেড়ে আসা কংগ্রেস এন সি পি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী নারায়ণ রানে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। রানেও হাইকম্যান্ডের ধামাধরা পৃথ্বীরাজ চৌহ্বানের নেতৃত্ব মানতে নারাজ। মোদী এই পরিবারবাদেরই নিরসন চেয়েছিলেন।

অসমের ক্ষেত্রে বিদ্রোহী মন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মার ক্ষোভের চরম পরিণতি হিসেবে দলে বিভাজনের প্রশ্ন উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তিনি নিজেকেই উদ্ধৃত করে বলেছেন, গগৈ-এর নেতৃত্বে লোকসভা ভোটে যে দল ৪টির বেশি আসন পাবে না তা দলের ৩টি আসন জেতায় প্রমাণিত হয়ে গেছে। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, গগৈ বহাল থাকলে আগামী বিধানসভায় কংগ্রেসের আসন ১০ এর নিচে নেমে যাবে। অন্যদিকে ১৩ জনের গগৈপন্থী একটি দল পত্রপাঠ বিশ্বশর্মার বিতাড়ন চেয়ে সোনিয়াজীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। অসম কংগ্রেস সরকারের পতন হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

প্লেগের মতোই দলছাড়ার ব্যাধি সুদূর জম্মু-কাশ্মীর থেকে পশ্চিমবঙ্গ কোনো— স্থান বিচার করেনি। উধমপুরের দু'বারের সাংসদ ও প্রবীণ কংগ্রেসী চৌধরী লাল সিং কংগ্রেস ত্যাগ করে চলে গেছেন। এখানে উল্লেখ্য দলীয় নেতা শুধু নয় নির্বাচনে বিধ্বস্ত কংগ্রেসে কিছু ভোটে না দাঁড়ানো রাজ্যসভার বাক্যবাগীশ নিরালম্ব নেতাকুল ছাড়া পূর্ববর্তী জোটসঙ্গীরাও দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করছে। সর্বশেষ বিয়োজন দীর্ঘসঙ্গী কাশ্মীরের পরিবারবাদের ধারক আবদুল্লাদের ন্যাশানাল কনফারেন্স। যাবার আগে লাল সিং কংগ্রেসকে একটি ঠগবাজ, বিশ্বাসঘাতক ও ধান্দাবাজদের দল বলে বিশেষিত করে গেছেন।

হেমন্ত বিশ্বকর্মা

নারায়ণ রানে

চৌধুরী লাল সিং

পশ্চিমবঙ্গে তো রক্তক্ষরণ রাজ্যে জোট ভাঙার পর থেকেই চলেছে অবিরাম। জেলায় জেলায় দল বদলের ফলে বহু পঞ্চায়েত, পৌরসভা বেহাত হতে থাকে। এ পর্যন্ত ৭ জন বিধায়ক দলত্যাগ করেছেন। এই দলবদল সগৌরবে চলেছে। গত ২১ জুলাই তিন তিন জন কংগ্রেসী বিধায়ক বিধানসভায় চিফ হুইপ-সহ তাঁদের মমতাদির মধ্যে পরমাত্মার গুণাবলীর সন্ধান পেয়ে দল ছেড়েছেন।

সেই 'পাগলা ভাত খাবি, না আঁচাবো কোথায়' প্রবাদ সত্যি করে দল পূর্বঘোষিত 'চিন্তন শিবির' বা এই নিষ্ক্রমণের বিপর্যয় ঠেকাবার কোনো তড়িৎ প্রচেষ্টায় না গিয়ে রাজ্যসভার গান্ধী পরিবারের পালিত নেতাদের দিয়ে দলত্যাগীদের চরিত্র হননে লিপ্ত রয়েছে।

দলত্যাগী ছয় বিধায়কের কাছ থেকে নির্বাচন কমিশন পদত্যাগপত্র চাইলে রাজ্যে আটটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে

গূঢ়পুরুষের

কলম

রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে খুব শীঘ্রই তার একটা প্রাথমিক পরীক্ষা হবে। পুজোর পরেই বিধানসভার দুটি আসন কলকাতার চৌরঙ্গী এবং উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে পারে। চৌরঙ্গীর সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক শিখা মিত্র পদত্যাগ করেছেন। তিনি প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ সোমেন মিত্রের স্ত্রী। সোমেনবাবু এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল দল ত্যাগ করে কংগ্রেসের টিকিটে উত্তর কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হন। নির্বাচনে লক্ষাধিক ভোট পেলেও তিনি তাঁর জামানত বাঁচাতে পারেননি। কিন্তু উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের চতুর্মুখী লড়াইতে তিনি ভোট কেটে বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্হাকে হারাতে তৃণমূলকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন। অ-বাম ভোট বিভাজনের সুযোগে তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হন। সোমেনবাবু পরে এই নিয়ে অন্তরঙ্গ মহলে দুঃখও করেছেন। আমি যতদূর জানি, সোমেনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী শিখা মিত্র এখন রাজ্য রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী তাঁদের বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন না। সোমেনবাবু জামানত হারানোর পর রাজ্য কংগ্রেস দলে গুরুত্বহীন হয়েছেন। শিখা মিত্রকে উপনির্বাচনে প্রার্থী করতে অধীরবাবুরা আগ্রহী নন। বাস্তবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে কংগ্রেস পুরোপুরি শক্তিহীন। কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হতে ওজনদার কোনো নেতা নেত্রী প্রার্থী হতেই চান না। সিপিএমের এখন ছন্নছাড়া অবস্থা। সম্প্রতি সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকেও এই কথাটি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য কমিটি মেনে নিয়েছে যে দলের গণসংগঠনগুলি যেমন, সিটু, ডি ওয়াই এফ, এস এফ আই, কৃষক সভা এবং গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি এখন জনসম্পর্কহীন সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়েছে। জনমানসে বাম গণসংগঠনগুলির বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই। সিপিএমের রাজ্য নেতাদের অস্বস্তি বেড়েছে, কারণ এইসব দলীয় শাখা সংগঠনগুলির নেতৃত্ব উল্টে বিমান-বুদ্ধদের অপসারণ চাইছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে উপনির্বাচনে প্রার্থী দিলে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। দক্ষিণ বসিরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম বিধায়ক নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এখানে উপনির্বাচন হবে। সিপিএমের একদা এই লালদুর্গে আজ লালবাতি জ্বালাবারও লোক নেই।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সাম্প্রতিককালে রাজ্যের ছয়জন বিধায়ক দলবদল করেছেন। নির্বাচনী আইনে স্পষ্ট বলা আছে যে দলবদল করলে পদত্যাগ করতে হবে। কিন্তু তাঁরা কেউই পদত্যাগ করেননি। কারণ, তাঁরা শাসকদলে যোগ দিয়েছেন এবং দলের প্রধান নেত্রী দেশের সংবিধান মানেন না। তাই তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আগে দলত্যাগী ছয় বিধায়ককে পদত্যাগ করার কথা নেত্রী বলেননি। এখন একমাত্র কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনই তাঁদের পদত্যাগপত্র চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে রাজ্যের মোট আটটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে পারে। বিধানসভার এই উপনির্বাচনকে ২০১৬-র নির্বাচনের আগে সেমিফাইনাল বলা যেতে পারে।

রাজ্যে বিজেপি-র উত্থান চমকপ্রদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। জনসমর্থনকে সংহত করে ভোটের যন্ত্রে প্রতিফলিত করতে হবে। বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমাদের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন। যে কোনো মূল্যে এই বিশ্বাস ও আস্থা আমাদের রক্ষা করতে হবে।' তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বকে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং দলের সঙ্গে সমন্বয় করার কাজকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সঙ্ঘের প্রচারকরা তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় যে ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করেন তাঁদের প্রদর্শিত পথে বিজেপি-র দলীয় কর্মীদের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। বিপদে আপদে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে স্বার্থহীনভাবে হতদরিদ্র অবহেলিত অত্যাচারিত পরিবারের সেবা করতে হবে। এই কাজ করতে গিয়ে শাসকদলের গুণ্ডা দুষ্কৃতীদের হামলায় মার খেলেও ভয় নেই। মনে রাখতে হবে, শাসকদলের প্রতিটি হামলার জবাব ভোটের যন্ত্রে প্রতিফলিত হবে। গুণ্ডারা শাসকদলের দলদাস পুলিশ ও প্রশাসনের মদতে বিজেপি-র কর্মী ও সমর্থকদের উপর হামলা চালাবেই। কারণ, দলের প্রতি জনসমর্থনে এখন ভাটার টান চলছে। কিন্তু শেষ কথা বলবেন সাধারণ মানুষ। কংগ্রেস এবং বামদলগুলির নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কর্মী সমর্থকরা মুচলেকা দিয়ে আত্মসমর্পণ করেননি। তাঁরা কমল ফুলের গৈরিক পতাকার তলায় আশ্রয় নিয়ে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে প্রস্তুত।

লোকসভার নির্বাচনে ভোট বিভাজনের সুযোগে তৃণমূল সাফল্য পেয়েছিল। বিধানসভার নির্বাচনে বাম ও কংগ্রেস দল শক্তিহীন হওয়াই বিভাজনের সুযোগ ততটা থাকবে না। তাছাড়া কেন্দ্রে শক্তিশালী বিজেপি সরকার থাকায় বাংলার জনমানসে আস্থা বাড়বে। মানুষ এখন বুঝেছেন যে কেন্দ্রের সঙ্গে শত্রু সম্পর্ক স্থাপন করে একদা সিপিএম এবং এখন তৃণমূল বাংলাকে পিছনের সারিতে নিয়ে গেছে। হাজার হাজার শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে শাসকদলের গুণ্ডাদের তাণ্ডবে। মানুষ রুজি রোজগার হারিয়েছেন। কেন্দ্রের বঞ্চনার কাঁদুনি গেয়ে মানুষকে এখন বোকা বানানো কঠিন। কোনো সন্দেহ নেই যে বাংলার মানুষের উপর প্রতিটি আঘাত সমানভাবে সমশক্তিতে প্রতিঘাত হয়ে ফিরে আসবে। আসতে বাধ্য। কারণ, বিজ্ঞানের সূত্রই এই কথা বলেছে।

খোলা চিঠি

অন্তরাত্মার খোঁজে বই লিখছেন ম্যাডাম

সোনিয়া গান্ধী
কংগ্রেস সুপ্রিমো
১০ জনপথ, নয়াদিল্লী

কাগজ-কালি-মন। লেখে তিনজন। এই তিনজনকে এক করে বসে পড়ুন ম্যাডাম। আপনার অন্তরাত্মা চ্যালেঞ্জের মুখে। কাগুজে প্রমাণ দিয়ে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সম্ভব কিনা জানি না। কিন্তু চেষ্টা যে করতেই হবে ম্যাডাম। প্রকাশকের অভাব হবে না। হটকেকের মতো বিক্রি হবে আপনার জবাবি কেতাব। বলা হয় একবার বিতর্ক তৈরি হয়ে গেলে বইয়ের বিক্রি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। আর আপনার বই তো লেখার আগেই বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। এখন থেকেই আপনি যদি পাবলিশার্সদের মধ্যে নিলাম ডাকেন তবে রাম না জন্মাতেই রামায়ণের নতুন রেকর্ড হয়ে যেতে পারে।

সবাই বলছে, নটবর সিং সত্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু আসলে নটবর মিথ্যাপ্রকাশ করে দিয়েছেন। আপনার অহঙ্কার মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন। এতদিন যেটাকে এই জগৎ আপনার স্বার্থত্যাগ বলে জানত সেটাকে এখন আপনার ভীতি বলে জানছে দুনিয়া।

কোনও উদারতায় নয়, স্রেফ ছেলে রাহুলের আপত্তিতেই ২০০৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়া হয়নি আপনার। ইন্দিরা গান্ধীর পুত্রবধূ তথা রাজীব পত্নী সোনিয়া নাকি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য লালায়িতই ছিলেন। কিন্তু ছেলে মায়ের আঁচল টেনে ধরায় তা সম্ভব হয়নি। নিজের আত্মজীবনী 'ওয়ান লাইফ ইজ নট এনাফ'-এ এমনই বিস্ফোরক তথ্য দিয়ে রাজনৈতিক মহলে হইচই ফেলে দিয়েছেন ২০০৮ সালে আপনার দল কংগ্রেস ছাড়া নেতা নটবর সিং।

এর আগে মনমোহন সিং-এর প্রাক্তন মিডিয়া উপদেষ্টা গত লোকসভা নির্বাচনের মুখে মুখে 'দ্য অ্যাকসিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, দ্য মেকিং অ্যান্ড আনমেকিং অফ মনমোহন সিং' বই লিখে কংগ্রেস ও আপনাকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলেছিলেন। এই নিয়ে নির্বাচনের বাজারে কম জলঘোলা হয়নি।

নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর এবার অস্বস্তি তৈরি করল নটবর। একেই বলে ঘরের শত্রু। গান্ধী পরিবারের আশ্রয়ে এতদিন থাকার পর এমনটা করা মোটেই ঠিক হয়নি নটবর সিংয়ের। আর আত্মজীবনী লেখারই বা কী দরকার ছিল? আর লিখলেই সব সত্যি লিখতে হবে এমন তো কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। আর সেই সত্যি লিখতে গিয়ে কিনা আপনার উদারতার মুখোশটা এক টানে খুলে দিলেন। সত্যিই এটা ভারী অন্যায়।

আত্মজীবনীতে নটবর সিং লিখেছেন, ২০০৪ সালে কোনো উদারতায় প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়েননি সোনিয়া গান্ধী। ছেলে রাহুলই সোনিয়াকে প্রধানমন্ত্রী পদে দেখতে চাননি। চোখের সামনে দিদিমা ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা এবং বাবা রাজীব গান্ধীর বিস্ফোরণে মৃত্যু দেখা রাহুল চাননি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সোনিয়ারও জীবন যাক। রাহুলের ভয় ছিল সোনিয়া প্রধানমন্ত্রী হলে ঠাকুমা ইন্দিরা ও বাবা রাজীবের মতোই জীবন দিয়ে মূল্য চোকাতে হবে। ছেলের ভয়ার্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত আকুতির সামনে শেষমেশ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশা ছেড়ে দেন সোনিয়া। আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিংয়ের নাম ঘোষণার সময় গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, অন্তরাত্মার নির্দেশে তিনি এমন কাজ করছেন।

২০০৪ সালে রাহুল সোনিয়াকে প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকে যখন বিরত করার চেষ্টা করছিলেন তখন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সুমন দুবেদের সঙ্গে নটবর সিং নাকি সেখানে হাজির ছিলেন। তবে, প্রধানমন্ত্রী না হলেও ইউপিএ সরকারের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সোনিয়াই নিতেন বলে দাবি করেছেন নটবর। পিএমও থেকে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সোনিয়ার কাছে পাঠানো হোত বলেও তাঁর দাবি।

ইউপিএ সরকারের বিদেশমন্ত্রী পদে থাকা নটবরের আরও দাবি, ১৯৯১ সালে রাজীবের মৃত্যুর পর সোনিয়া চেয়েছিলেন শঙ্করদয়াল শর্মা প্রধানমন্ত্রী হন। সে সময় রাষ্ট্রপতি পদে আসীন শঙ্করদয়াল শর্মা নিজের খারাপ স্বাস্থ্যের কথা বলে এড়িয়ে যান। শেষমেশ পিভি নরসিমা রাওকেই প্রধানমন্ত্রীর পদে বসাতে হয় সোনিয়াকে। যা আদপে কোনো দিনই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি রাহুল-প্রিয়াঙ্কার মা।

২০০৮ সালে 'তেলের জন্য খাদ্য কেলেঙ্কারি' বিতর্কে আপনি দল থেকে সরিয়ে ছিলেন নটবরকে। আর এখন সেই কেলেঙ্কারিতেও আপনার দলের নাম জুড়ে দিয়েছেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী। তিনি সম্প্রতি বলেছেন, ওই কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত ভোলকার কমিটির রিপোর্টে কংগ্রেসকে 'নন কনট্র্যাকচুয়াল বেনিফিশিয়ারি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল যা রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভাষায় দুর্নীতির সমতুল্য।

ম্যাডাম প্লিজ, এই বিশ্বাসঘাতককে ছেড়ে কথা বলবেন না। আপনিও বই লিখুন। দেশবাসী অপেক্ষায় আছে বই লিখে প্রমাণ করুন আপনার অন্তরাত্মার অস্তিত্ব। এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নন। নরেন্দ্র মোদী। সুতরাং আপনাকে এখন আর প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ফাইল সামলাতে হয় না। দলের অবস্থাও যা তাতে খুব বেশি কিছু কাজ নেই। অখণ্ড অবসর। এই ফাঁকে বইটই লিখুন। পাবলিশার্স রেডি আছে।

— **সুন্দর মৌলিক**

উত্তর সম্পদকীয়

প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে মোদী সরকারের কৌশলগত পদক্ষেপ

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের পর নতুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি সম্প্রতি লোকসভায় ভারতের যে বাজেট পেশ করেছেন, তাতে ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রকে বিদেশিদের জন্য 'উন্মুক্ত' করে দিয়েছেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, এই বাজেটে তা স্পষ্ট করেছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। আর এই শুভ ক্ষণটির জন্যই পশ্চিমের মোড়লরা উন্মুখ হয়ে বসেছিল।

এখন পশ্চিম বিশ্বের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ভারতের প্রতিরক্ষা খাতকে রঙিনভাবে সাজিয়ে দিয়ে বিপুল বাণিজ্যের মাধ্যমে বিশাল ভারতকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসা। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই বাজেট পেশের অনেক আগে থেকেই পশ্চিমাদের 'নজর' ছিল এই বাজেটের দিকে। ভারতকে নিজেদের কব্জায় রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এমনকী রাশিয়া সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা গোপনে এবং প্রকাশ্যে ভারত সফরের কর্মসূচিও তৈরি করে ফেলেছেন। ইস্রায়েলও ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদনের বাজারে ঢুকতে আগ্রহী। এই সুযোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তাঁর পুরনো সোভিয়েত যুগের অস্ত্রভাণ্ডার আধুনিকীকরণের দিকে নজর দিচ্ছেন, যা ভারতে পূর্বের কোনো সরকারই নজর দেয়নি। মোদীর লক্ষ্য ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অস্ত্র আমদানিকারক দেশের বিপরীতে ভারতকে শক্তিশালী অস্ত্র উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদী শপথ নেওয়ার পর থেকে বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার কথা বলে আসছিলেন। তিনি এবার সেই কথা রাখলেন। রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া রেলের বাজেট পেশ করার সময় বলেছিলেন, ভারত ঔপনিবেশিক আমলে স্থাপিত জরাজীর্ণ রেলের উন্নয়নে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) গ্রহণ করবে। দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও পরিকাঠামো উন্নয়নেই সরকার এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে। মান্ধাতা আমলের রেলপথ সংস্কারে আগামী পাঁচ বছরে দেশের প্রয়োজন অন্তত নয় হাজার তিন শ' কোটি মার্কিন ডলার। ভারতীয় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম। দৈনিক উনিশ হাজার ট্রেন চলাচল করে। এসব ট্রেনের মাধ্যমে প্রতিদিন দু' কোটি ত্রিশ লক্ষ যাত্রী ও ছাব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মেট্রিকটন মাল পরিবহন করা হয়। কিন্তু প্রতিরক্ষা বাজেটে বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিতভাবে এটি নরেন্দ্র মোদীর আরেকটি চমক।

পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন যে, প্রতিরক্ষা বাজেটে বিদেশি বিনিয়োগের কথা বলে পশ্চিম বিশ্বকে সরাসরি দেশের মাটিতেই আমন্ত্রণ জানালেন মোদী সরকার। প্রতিরক্ষা খাতের কয়েকটি বিশেষ প্রকল্পকে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে তুলে দেওয়ার কথা বললেন অরুণ জেটলি। গ্রেট বৃটেনের কিংস কলেজ লন্ডনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক হার্শ বলেছেন, ভারতীয় বাজার ব্যবস্থায় একটি নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে মোদীর আমলে। এ ধরনের ইঙ্গিত পাওয়ার পর পরই বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ স্বার্থের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে উঠছে। এরই অংশ হিসেবে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এক ভারতীয় বৈদ্যুতিন চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিনটন বলেছেন যে, 'নরেন্দ্র মোদীর ভিসা বিতর্ক এখন অতীতের বিষয়'।

উল্লেখ্য যে, ২০০২ সালে গুজরাটের দাঙ্গায় রাজ্যের তৎকালীন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক ওঠার প্রেক্ষাপটে ২০০৫ সালে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডাব্লিউ বুশের প্রশাসন নরেন্দ্র মোদীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এমনকী মোদীর পর্যটন ভিসাও তখন বাতিল করা হয়। মোদীকে এই অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদীও আর কোনোদিন মার্কিন মুলুকে যাওয়ার জন্য ভিসার আবেদন করেননি। শুধুমাত্র ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে 'দখলে' রাখার জন্যই তড়িঘড়ি করে বারাক ওবামা মোদীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অথচ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র দখলের লক্ষ্য নিয়ে নয়াদিল্লীতে প্রথম সফরে আসার কথা ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী লবেন্ট ফাবিয়াস। তাঁর বৈঠক করার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও অর্থ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে। ফাবিয়াস মূলত ভারতে একশ ছাবিশটি যুদ্ধ বিমান বিক্রয় সংক্রান্ত প্রায় এক হাজার পাঁচ শ' কোটি মার্কিন ডলারের একটি স্থগিত চুক্তি বাতিল করতে চান।

তিনি চুক্তিটি সম্পাদন ও অর্থ ছাড়ের সময় নির্ধারণ করে ফেলতেই আগ্রহী। এর পরেই নয়াদিল্লী আসার কথা মার্কিন সেনেটর জন ম্যাক কেউনের। ভারতের অর্থনৈতিক

ও সামরিক উত্থানের প্রক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত হওয়া উচিত বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সমর্থন, প্রযুক্তি ও সহযোগিতা নিয়ে ভারত বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এদিকে বছরের পর বছর ধরে ভারতের অস্ত্রের চাহিদা পূরণকারী দেশ রাশিয়াও কিন্তু বসে নেই। বসে নেই গ্রেট বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম হেগ। তিনি এবং অর্থমন্ত্রী জর্জ অসবর্নও এক সঙ্গে ভারত সফরে আসছেন। রাশিয়া তাদের পুরনো মিত্র নয়াদিল্লীর নতুন বিজেপি সরকারের উদ্যোগের অংশীদার হওয়ার লক্ষ্যে এরই মধ্যে তাঁদের উপপ্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি রোগোজিনকে ভারতে পাঠিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য গত বছর রাশিয়াকে পেছনে ফেলে ভারতে অস্ত্র সরবরাহকারী শীর্ষদেশে পরিণত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি নিশা বিসওয়াল বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় ভারত আঞ্চলিক পর্যায়ে একটি অধিকতর শক্তিশালী ও নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হোক।

ভারতের নতুন বিজেপি সরকার জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়টি যে বিশেষ বিবেচনায় রেখেছেন, তার প্রমাণ হলো শপথ গ্রহণের মাত্র কয়েক দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ছোটদেশ ভুটান সফর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে একজন অভিজ্ঞ এবং তুখোড় প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্মকর্তা অজিত কুমার দোভালকে নিয়োগ। মাত্র সাতচল্লিশ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট একটি দেশ হলো ভুটান। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নে এই দেশটির গুরুত্ব বিবেচনায় এনে স্বাধীনতার পরপরই ১৯৪৯ সালে স্বাক্ষর করেছিলেন ভারত-ভুটান দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা চুক্তি। ২০০৭ সালে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সেই চুক্তি আবার নবীকরণ করে। মোদী সরকার ভারত-ভুটান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে পারেন তার ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বয়ং মোদী। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতার পর ভুটানের পূর্বে অবস্থিত অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের বিরোধ আজও মেটেনি। অরুণাচল প্রদেশ পুরোটাই চীন তাদের নিজস্ব ভূমি বলে এখনও দাবি করে আসছে। সাম্প্রতিক সময়েও চীন নতুন করে তাঁদের মানচিত্রে অরুণাচলকে দক্ষিণ তিব্বতের অংশ হিসেবে দেখিয়েছে। নেপালের পশ্চিমে লাদাখ সীমান্ত নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্ব এবং এই সীমান্ত দ্বন্দ্ব নিয়ে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারত চরমভাবে 'অপদস্থ' হয়েছিল, সেই বেদনাদায়ক ইতিহাস ভারত আজো ভোলেনি। নেপালের পূর্ব সীমান্তে 'সিকিম' নামের যে দেশটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, ভারতে যুক্ত হয় মূলত নিরাপত্তার স্বার্থে। সিকিমকে গিলে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল লালচীন। এখন সিকিম ও ভুটানের মাঝখানে ভারতের ছোট্ট একটি করিডর, যে পয়েন্টে চীন ভারত সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তের দূরত্ব মাত্র পঁচানব্বই কিলোমিটার।

সামরিক দৃষ্টিতে পঁচানব্বই কিলোমিটার কোনো দূরত্ব নয়। কোনো কারণে এই পাঁচনব্বই কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত একটি শক্তিশালী সামরিক ব্লক তৈরি হলে ভারতের উত্তর-পূর্বের সাতরাজ্য ভারত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। সেই পরিস্থিতিতে সাতরাজ্যের রক্ষাকবচ হিসেবে ভারতের কাছে বাংলাদেশের বন্ধুত্বও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এ জন্য মোদী সরকার ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো জোরদার করতে চায়। বিজেপি-র প্রবীণ নেতা যশোবন্ত সিং সম্প্রতি তাঁর নিজের লেখা একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ভারতকে ঘিরে ফেলার জন্য এবং ভারতের জল ও স্থলভাগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তারের এক মহাপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে চীন। তাদের ভূমিকায় সন্ধিগ্ধ মোদী সরকার। নতুন করে সম্প্রতি চীন আবার তার নতুন মানচিত্রে অরুণাচল প্রদেশকে চীনের মূল ভূখণ্ড হিসেবে দেখিয়েছে। তারা জম্মু ও কাশ্মীরের বিশাল এক অংশকেও নিজেদের ভূমি বলে দাবি করছে। এমন সব বিপদের কথা মাথায় রেখেই নরেন্দ্র মোদী তাঁর বিদেশ নীতি 'মেরামত' করছেন। আর তারই অংশ হিসেবে ভারতের প্রতিরক্ষা খাতকে 'উন্মুক্ত' করে দিয়েছেন পশ্চিমি বন্ধুদের জন্য, যারা এতদিন তাঁর শত্রু ছিল।

পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন যে, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে অস্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থার একশ শতাংশ বিদেশি লগ্নির আহ্বান রাজনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার কৌশলগত দিক দিয়ে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাতে কোনো খামতি রাখতে রাজি নয়। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির চেয়ে বিদেশি লগ্নিকারিদের জন্য প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থার একশ শতাংশ উন্মুক্ত করে দেওয়ার সাহসী নীতিতে একদিকে দেশের নিরাপত্তার ফাঁক ফোকর যেমন বুজিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে, ঠিক তেমনি প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থায় গতি আসলে বহু যুবকের কর্মসংস্থানও সম্ভবপর হবে। ভারতে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থা বিদেশি সংস্থা ও লগ্নিকারিদের জন্য খুলে দেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইস্রায়েল তো বটেই চীনও ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে লগ্নির ইচ্ছা প্রকাশ করলে তা মোটেই অপ্রত্যাশিত হবে না।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা
প্রতি কপি ১০ টাকা

অখণ্ড ভারতের প্রাসঙ্গিকতা

ড. ভাস্কর পুরকায়স্থ

“ভারতীয় শক্তির মূলে অধ্যাত্মবাদ সর্বদাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণকর রূপকেই পূজা করেছে— এই ভাবনা মানবপ্রেমের, মানবমুক্তির পথ।”

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। একই দিনে ইংরেজ দুটি দেশকে বিভাজিতও করেছিল। লক্ষ মানুষের বলিদানে খণ্ডিত স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। অখণ্ড ভারত আমরা হারিয়েছি। আজও অখণ্ড ভারতরাষ্ট্রের প্রবীণ মানুষের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে জন্মস্থানের স্মৃতিচারণায়। বাংলা এবং পাঞ্জাব সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থনীতি, সংস্কৃতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। সুদূরপ্রসারি দেশভাগের এই ক্ষতি পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও অত্যন্ত বেদনার। কারণ আজন্ম গুরুজনদের স্মৃতিচারণা অব্যক্ত যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও দেশের জন-বিন্যাস, বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘটনা পরম্পরায় বিভাজন ভীতি নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে। অসম, পশ্চিমবাংলা পুনরায় বিপর্যয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। স্বাধীনতার সময়ে বিভাজনের পরিকল্পনা সাধারণ মানুষ বুঝতেও পারেনি। গান্ধীজীর দেশভাগ-বিরোধী বক্তব্য থেকে এরকম মনেই হয়নি যে দেশভাগ হবে। যখন বিভাজন নিশ্চিত হলো তখন কংগ্রেসী নেতারা বলেছিলেন, এই বিভাজন অস্থায়ী। কাশ্মীরকে ৩৭০ ধারায় বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার সময়ও অস্থায়ীভাবের কথা বলা হয়েছিল। আজ সবই স্থায়ী হয়েছে, অস্থায়ী প্রমাণিত হয়েছে নেতাদের আশ্বাস। ভৌগোলিক খণ্ডিতকরণের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে। দুটি পৃথক সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা চাপিয়ে দেওয়া হতে থাকে। সামাজিক, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক আঘাত নেমে আসে এবং সংস্কৃতি বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। অর্থনীতির চালচিত্র বদলাতে থাকে। দুটি দেশের কৃষি, শিল্প, জোগান সবকিছুই বণ্টিত হয়ে যায়, অর্থনীতির স্কেল কমে যায়, অনেক শিল্প উঠেই যায়। যেমন হয়েছে অবিভক্ত বাংলার পাটশিল্পে। চরম আর্থিক বিপর্যয়ে জীবনযাপনের মান নিম্নমুখী হয়।

‘ভাগ করে শাসন কর’ :

সীজার এবং নেপোলিয়ান এই গ্রীক তত্ত্বের রূপকার। প্রাচীনকাল থেকেই ভারত নামক পুণ্যভূমি ছিল জগতসেরা। শিক্ষায়, দীক্ষায়, আর্থিক স্বচ্ছলতায় ভারতকে বিশ্বগুরু হিসেবে গণ্য করা হোত। শিক্ষক তথা গুরুর অভাব ছিল না। প্রত্যেক গ্রামে শিক্ষালয় ছিল, নিঃশুল্ক বিদ্যাভ্যাস চালু ছিল। অন্ন কোথাও বিক্রি হোত না, হোটেলের কোনো প্রচলন প্রাচীন ভারতে ছিল না। বিজ্ঞানে, আবিষ্কারে ভারত ছিল পথপ্রদর্শক। স্বাধীনতার সময় ভারতে রপ্তানি বাণিজ্য অধিক ছিল। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ছিল, ঘাটতির কোনো প্রশ্নই ছিল না। আজ অখণ্ড ভারতের দেশসমূহে ভারতের মতোই ঘাটতি বৈদেশিক বাণিজ্য, দারিদ্র্য, হানাহানি, পারস্পরিক অবিশ্বাসের পরিবেশ ক্রমশই বাড়ছে। বৃটিশ ভারত ত্যাগের পূর্বে কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতালোভী মানুষের দ্বারা

আমাদের মাতৃভূমির বিভাজন ঘটে গেল। দেশীয় মীরজাফরদের সহায়তায় এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আজও সেই বিভাজন-নীতি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-সহ সকল সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমানে চলেছে। দেশপ্রেম, মানবতা আজ গল্পগাথায় সীমাবদ্ধ।

অখণ্ডতার তত্ত্ব :

ঋষি অরবিন্দ, বীর সাভারকর, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষী আজীবন অখণ্ড ভারত ও হিন্দু সংস্কৃতির ধ্বজা উর্ধ্বে উঠিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ডাক্তারজী, গুরুজী সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই কাজে কোটি কোটি ভারতবাসীকে যুক্ত করেছেন। সাভারকরের মতে— হিমালয়ের দক্ষিণভাগ এবং হিন্দুকুশ পর্বতমালা ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ অর্থাৎ অখণ্ড ভারত। ঋষি অরবিন্দর মতে, ভারত আবার অখণ্ড হবে, কারণ অখণ্ড হওয়াই ভারতের নিয়তি। তিনি ভারতমাতাকে শুধুমাত্র বিশ্বের একখণ্ড জমিতে আবদ্ধ করেননি; ভারতমাতা শক্তি, দেবীর প্রতিমূর্তি। সমস্ত দেশই মাতৃস্বরূপা যিনি নিজদেশকে সন্তানের মতো স্বকীয়তায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। দেশমাতৃকারূপী এই সর্বশক্তিমান অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অংশস্বরূপ হয়ে মানবজাতির চেতনাকে জাগরিত করে। মানবমনের অজ্ঞতাই তাকে ভাবায় যে জাগতিক বিষয়সমূহ তাদেরই সৃষ্টি, এর উর্ধ্বে কোনো শক্তি নেই, ভারত স্বাধীন হয়েছে কিন্তু ঐক্য অর্জন করেনি; এই স্বাধীনতা কেবলই আংশিক।...হিন্দু মুসলমানের বিভেদ স্বাধীনতা দ্বারা রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে আরও পুঞ্জীভূত এবং স্থায়ী হয়েছে।

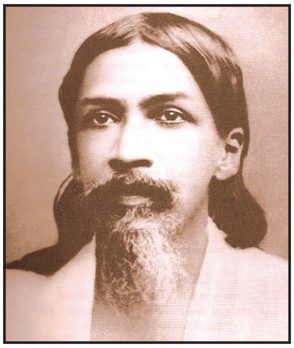
শ্রীঅরবিন্দ

বীর সাভারকর

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

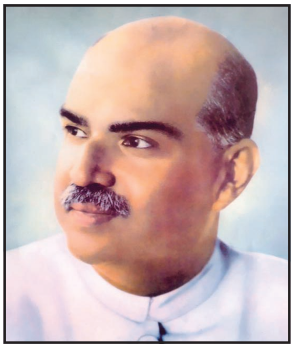
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আফ্রিকা, ইউরোপ-সহ এশিয়ার বহু দেশই বিভাজন হয়েছে। উল্লেখযোগ্য হলো, অনেক দেশ পুনর্বার একত্রিত হয়েছে, অখণ্ড হয়েছে। ইজরায়েল, জার্মানি, সম্প্রতি রাশিয়া ও ক্রিমিয়া পুনরায় একত্রিত হয়েছে, চীন, তিব্বত এবং হংকং অঞ্চলকে নিজের দেশের অন্তর্ভুক্ত করেছে। হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, সিকিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতএব অখণ্ডতা কোনো অলীক কল্পনা নয়, বাস্তবমাত্র। অখণ্ড ভারত এক সাংস্কৃতিক সঙ্কল্পনা। 'এক রাষ্ট্র অনেক রাজ্য'— এটাও এক ধরনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা যা পূর্বেও ছিল ও ভবিষ্যতেও হতে পারে। অখণ্ড ভারতের জন্য সমস্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক একাত্মতার ভাবনা আবশ্যক।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট :

ভৌগোলিক সীমানাবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মধ্যে সদর্থক সম্পর্ক রয়েছে, অবশ্যই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বণ্টনের মাধ্যমে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সিনার্জি এবং স্কেল কথাদুটি বহুল প্রচলিত। সিনার্জির অর্থ হলো দুটি কোম্পানি একত্রীকরণ হলে যৌথ বিক্রি, মুনাফা স্বাভাবিক ভাবেই পৃথক দুটি কোম্পানির যোগফলের তুলনায় বেশি হয়। উৎপাদনের স্কেল যত বেশি হবে, নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত, ততই উৎপাদন ব্যয় কমবে। দাম কমবে, বিক্রি বাড়বে।

১২৫০ বৎসর পূর্বের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ভারত থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের বিভাজনের পূর্বের ভারত অবধি বিস্তৃত সময়কালে এই পুণ্যভূমি হারিয়েছে প্রায় ৫০, ১৫, ২৯০ বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড, বর্তমান ভারতের ভূখণ্ডের পরিমাণ ৩২, ৮৭, ৫৯০ বর্গকিলোমিটার। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ভারতের জমি ও ১৯৬২ সালে চীন নেফা ও লাদাখের কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার জমি দখল করেছে। বিভিন্ন সময়ে ভারত থেকে বিভাজিত দেশসমূহের বর্তমানে মোট জাতীয় আয় প্রায় ১.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতের মোট জাতীয় আয় ৫.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতের প্রগতি হিন্দু সংস্কৃতির ফলেই সম্ভব হয়েছে। বিভাজিত দেশসমূহ কায়েমি স্বার্থের হাত থেকে রক্ষা পেত ও আর্থিক, সাংস্কৃতিকভাবে আরও অগ্রসর হোত।

আশার কথা, দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা বা সার্ক গঠনের ফলে মায়ানমার ও তিব্বত ছাড়া বাকি বিভাজিত দেশগুলো পুনরায় আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক ভাবে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। এই সংস্থাকে আরও বেশি নিজ প্রয়োজনে একীভূত হতে হবে। এই দেশসমূহের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একই মূলস্রোত থেকে প্রবহমান। সাংস্কৃতিক মানবতাবাদ পারস্পরিক হিংসা, দ্বেষ নিরসনের একমাত্র উপায়।

অখণ্ডতার আদর্শে অবিশ্বাসী কতিপয় মানুষ রাষ্ট্রপ্রেম ভাবনাকে ক্ষুদ্রভাবে বিশ্লেষণ করে। ভারতীয় শক্তির মূলে অধ্যাত্মবাদ সর্বদাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণকর রূপকেই পূজা করেছে--- এই ভাবনা মানবপ্রেমের, মানবমুক্তির পথ। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর, মহর্ষি অরবিন্দ, শ্রীগুরুজী, ডাক্তারজী, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মহাপুরুষের মনে দেশভাগের অত্যন্ত বেদনা ছিল। দেশপ্রেম সঞ্জাত অখণ্ডতার ভাবনাই অমৃতের পথে নিয়ে যাবে।

(লেখক হেরম্বচন্দ্র কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর)

অনুপ্রবেশ বন্ধ না হলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে

মোহিত রায়

১৯৪৭ সালে অ-মুসলিমপ্রধান রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম। দেশভাগের সময় পাঞ্জাব ও বাংলার অবস্থার মধ্যে বড় পার্থক্য ঘটে গেল এটাই যে পাঞ্জাবের মতো বাংলায় সংখ্যালঘু বিনিময় হলো না। ভারতে অন্তর্ভুক্ত পূর্ব পাঞ্জাবে ১৯৪১ সালে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৩৩.০৯ শতাংশ যা কিনা ১৯৫১ সালে কমে ১.৮ শতাংশে দাঁড়ায়। এবং পরেও খুব একটা বাড়েনি। ফলে দেশভাগের প্রথম ক'মাস দাঙ্গা হলেও পরবর্তী ৬০ বছরে দুই পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান বা শিখ-মুসলমান দাঙ্গা হয়নি। বি আর আম্বেদকর দেশভাগের অনেক আগে ১৯৪০ সালেই সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন, ‘‘সংখ্যালঘু বিনিময়ই নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধান।”

বিপুল বেআইনি বিদেশী জনগোষ্ঠী দরিদ্র পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ক্ষতি করছে, রাজ্যের জমি বিদেশীরা কিনে নিচ্ছে, দূষিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি। অনুপ্রবেশ একটি বাংলা শব্দ, এর সম্যক অর্থ যদি রাজ্যের নেতারা না বোঝেন তবে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ হতে বেশি সময় নেবে না।

১৯৪১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ২৯.৫ শতাংশ যা ১৯৫১ সালে কমে দাঁড়ায় ১৯.৫ শতাংশ, আবার ২০০১ সালে বেড়ে হয় ২৫.৫ শতাংশ। ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন যেখানে ‘দুই দেশের সংখ্যালঘুদের সমানাধিকারের ভরসা দেওয়া হয়’। এই চুক্তিতে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের ‘অবাধ গতিবিধি’র অধিকারের কথাও বলা হলো। এই চুক্তির কারণেই তৎকালীন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন। ১৯৫০ সালের ১৪ এপ্রিল সংসদে তিনি বলেন,— ‘দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ১৬ থেকে ২০ লক্ষ হিন্দুকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে পাঠানো হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশ থেকেও প্রায় ১০ লক্ষ ছিন্নমূল হিন্দু চলে এসেছে। ব্যাপক সংখ্যায় হিন্দুরা আসতেই থাকবেন, আর যাঁরা আসবেন তাঁরা ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না। অন্যদিকে যে সমস্ত মুসলমান চলে গিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে আসবেন এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস চুক্তিটির একতরফা রূপায়ণে মুসলমানেরা ভারত ছেড়ে যাবেন না। আমাদের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং আমাদের দেশের মধ্যেকার সংঘাত আরো বেড়ে যাবে।’

এর কয়েক মাসের মধ্যেই, ১৯৫০ সালের ৮ অক্টোবর, পাকিস্তানের লিয়াকত আলি খান সরকারের আইন ও শ্রমমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন বাংলার তফসিলি জাতির প্রধান নেতা, যিনি তফসিলি জাতি ও মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী ও প্রচারক ছিলেন। দেশভাগের পর তাঁকে সসম্মানে পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালের পাকিস্তানে হিন্দু (তফসিলি সহ) বিরোধী দাঙ্গার পর মুসলিম লিগের কাছের মানুষ এই মন্ত্রীমশাইকে তিন

বছরের মধ্যেই কল্পিত স্বর্গরাজ্য ছেড়ে ‘ব্রাহ্মণ্যবাদী’ হিন্দুস্থানে পালিয়ে আসতে হয় এবং হিন্দুস্থানে থেকেই তিনি পদত্যাগ পত্র পাঠান। যাঁরা এখনো দলিত-মুসলিম ঐক্যের ধ্বজাধারী তাঁদের জন্য তাঁর পদত্যাগ পত্রের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন। শ্রী মণ্ডল লেখেন— ‘‘সুদীর্ঘ ও উদ্বেগময় সংগ্রামের পর শেষ পর্যন্ত আমাকে একথাই বলতে হচ্ছে যে পাকিস্তান আর হিন্দুদের বাসযোগ্য নয়। তাঁদের ভবিষ্যতে প্রাণনাশ ও ধর্মান্তরকরণের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে। অধিকাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দু ও রাজনৈতিক সচেতন তপসিলি জাতির লোকেরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে গেছে। যে সমস্ত হিন্দু এই অভিশপ্ত দেশে অর্থাৎ পাকিস্তানে থেকে যাবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ধীরে ধীরে এবং সুপরিকল্পিত ভাবে তাদের মুসলমানে পরিণত করা হবে বা নিশ্চিহ্ন করা হবে।’’

এরপর অনুপ্রবেশ

পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন অব্যাহত রইলো। পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে যাওয়া মুসলমানদের অনেকেই ফিরে এলেন। ১৯৫১-৬১-তে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি শ্যামাপ্রসাদের সতর্কবাণীর সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। পূর্বপাকিস্তান থেকে কাতারে কাতারে হিন্দু উদ্বাস্তুর আগমনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩৩.৩ শতাংশ, আর মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল আরো বেশি ৩৩.৭ শতাংশ! কারণ নেহরু-লিয়াকত চুক্তির সুযোগে পূর্বপাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানরা ফিরে আসেন আর হিন্দু উদ্বাস্তুদের সংগঠক শ্যামাপ্রসাদকে নিন্দা করে দাবি করে মুসলমানদের ফিরিয়ে আনতে হবে। ১৯৭২-এ বাংলাদেশ হবার কয়েক বছরের মধ্যেই আবার দলে দলে মুসলমানদের ভারতে আসার ঢল শুরু হলো। ১৯৫১-র রাষ্ট্রসঙ্ঘের কনভেনশনে যা ১৯৬৭-র প্রোটোকলে সংশোধিত হয় তাতে উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে— ‘‘যে ব্যক্তির জাতি, ধর্ম, নাগরিকত্ব বা কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্থার সভ্য হবার জন্য নিপীড়িত হবার যথেষ্ট উপযুক্ত আশঙ্কা রয়েছে বলে তার নাগরিকত্ব যে দেশের তার বাইরের দেশে রয়েছেন, অথবা এই ভীতির জন্য তার দেশের নিরাপত্তা নিতে আগ্রহী নন, অথবা এই সব কারণে নিজের দেশের বাইরে রয়েছেন এবং ফিরতে পারছেন না বা এই ভীতির জন্য ফিরতে ইচ্ছুক নন।’’ মনে রাখতে হবে যে অর্থনৈতিক কারণে চলে আসা কাউকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংজ্ঞায় উদ্বাস্তু গণ্য করা যায় না। কেবল হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টানরা উদ্বাস্তুর মর্যাদা পেতে পারেন। বাংলাদেশী মুসলমানরা হচ্ছেন অনুপ্রবেশকারী।

মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির সবচেয়ে ভয়ানক সময়টি চলে কমরেড জ্যোতি বসুর আমলে। যে অনুপ্রবেশের বন্যা শুরুর জন্য দায়ী তিনি নিজেই, সেই অনুপ্রবেশের ভয়াবহ চিত্র জ্যোতি বসু নিজেই সিপিআইএম-এর মুখপত্র গণশক্তির ১১ অক্টোবর, ১৯৯২ সংখ্যায় লিখেছেন— ‘‘১৯৭১ থেকে মুসলমানরাও ভারতে আসতে শুরু করলো। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বি এস এফ ২,৩৫,৫২৯ জন বাংলাদেশীকে সনাক্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৮,৪৭২ জন হিন্দু ও ১,৬৪, ১৩২ জন মুসলমান। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত মোবাইল টাস্ক ফোর্স ২,১৬,৯৮৫ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৫৬,৩৪২ জন হিন্দু ও ১,৬৯,৭৯৫ জন মুসলমান।’’ সরকারি ভাষ্যেই ১৫ বছরে সাড়ে চার লক্ষ বাংলাদেশীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যার প্রায় ৭৫ শতাংশ মুসলমান। পশ্চিমবঙ্গে যদি জনসংখ্যা ও জনবিন্যাস নিয়ে গবেষণা ও অধ্যয়নে বিন্দুমাত্র সততা থাকত, তবে ১৯৯১-এর জনগণনার ফল প্রকাশের পর এইটিই গবেষণার অত্যন্ত জরুরি বিষয় হোত। না, কিছুই হয়নি। একমাত্র একদা কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ও ফজলুল হকের পরিবারে বিবাহ করা ঐতিহাসিক অধ্যাপক অমলেন্দু দে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশ নিয়ে ১৯৯৩ সালেই একটি পুস্তিকা লেখেন। পুস্তিকাটি সিপিআইএমের পত্রিকায় যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছিল। অমলেন্দু দে লিখেছেন— ‘‘পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে যেভাবে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সেখানে যদি ধর্মীয় মৌলবাদীরা সংগঠিত হবার সুযোগ পায়, তাহলে ভারতের সেকিউলার মডেলটি বিপর্যস্ত হতে পারে...।’’ আশঙ্কাটিকে বাস্তব করতে গত ত্রিশ বছর ধরে প্রথমে সিপিআইএম কিছুটা ধীর গতিতে এবং গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস দ্রুত গতিতে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজকে ঠেলে দিচ্ছে ইমাম-মাদ্রাসা সংস্কৃতির অন্ধকারে।

সিকি শতাব্দী জমিয়ে রাখা এই সমস্যা এখন দানবিক রূপ নিয়েছে। ভারতের প্রথম কমুনিস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ৬ মে, ১৯৯০-এ লোকসভায় জানান যে ভারতে ১ কোটি বেআইনি ভাবে আসা বাংলাদেশী রয়েছে। ১৪ জুলাই, ২০০৪-এ লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে কংগ্রেসের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সোয়াল জানালেন যে ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বেআইনি বাংলাদেশী রয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে ৫৭ লক্ষ বেআইনি ভাবে আসা বাংলাদেশী। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি হিসাব বলে সংখ্যাটি অনেক কম। তবে বাংলাদেশের উধাও জনসংখ্যা, সীমান্তে ধৃত বাংলাদেশীদের তথ্য, বিভিন্ন জেলার মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি— এইসব থেকে ধারণা করা যায় পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা ১ কোটির কাছাকাছি, রাজ্যের জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ। এই বিপুল বেআইনি বিদেশী জনগোষ্ঠী দরিদ্র পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ক্ষতি করছে, রাজ্যের জমি বিদেশীরা কিনে নিচ্ছে, দূষিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি। অনুপ্রবেশ একটি বাংলা শব্দ, এর সম্যক অর্থ যদি রাজ্যের নেতারা না বোঝেন তবে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ হতে বেশি সময় নেবে না।

(লেখক একজন অধ্যাপক ও পরিবেশবিদ)

শ্রীঅরবিন্দের মহাসমন্বয়

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

দেশের বর্তমান সময়কার নানাবিধ বিপর্যয়ের দিনে আমরা অনেকেই ভুলে গেছি যে এই দ্বিধাবিভক্ত হতভাগ্য বাংলাদেশে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত একের পর এক মহাপুরুষ, মহামনীষী ও মহাকর্মীগণ এই বাংলার কোলে জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে কীর্তি রেখে গেছেন। স্বাধীনতা দিবস স্মরণে তাঁদের জীবনচিত্র অনুধ্যান করা প্রয়োজন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা সারা ভারতের প্রতিভূরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই আন্দোলনের প্রেরণা ও নেতৃত্ব প্রকাশকে যেমন সুরেন্দ্রনাথের থেকে দেশবাসী লাভ করে, তেমনি এই আন্দোলনের গভীর উৎসস্থানীয় ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনি এই আন্দোলনে এক ঐশীশক্তির প্রেরণা সঞ্চার করেন যা অন্য কোনো নেতার পক্ষে সম্ভব হোত না। এই প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অধ্যাত্মসাধনা ও কর্মযোগের অনিবার্য পরিণতিরূপে। শ্রীঅরবিন্দ পদর্শিত পথে চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ বাংলার বীরসন্তানরূপে অবদান রেখে গেছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ শুধু রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না— তিনি ছিলেন ভারতের অধ্যাত্মমূলক সাধনা ও সংস্কৃতির অভিনব শিল্পী। ভারতের পূর্ণাঙ্গ নবজাগরণের প্রেরণাদাতা, পথপ্রদর্শক— ভারতের গুরু ও জগতের গুরুস্থানীয় ছিলেন তিনি। একথা চিত্তরঞ্জন থেকে আরম্ভ করে সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই পনেরই আগস্ট তথা তাঁর জন্মদিনে সমগ্র দেশবাসীর কর্তব্য শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ স্মরণ এবং তাঁর অমর বাণীর স্মরণ ও মনন।

শ্রীঅরবিন্দ আমাদের সামনে অভিনব ভারতের একপূর্ণাঙ্গ সভ্যতার চিত্র তুলে ধরেছিলেন। সেই সভ্যতা— বিভক্ত ভারতে সম্ভব হতে পারে না। সেই সভ্যতার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসী এক সঙ্গে সমন্বয়ে সম্মিলিত। ধর্মানুযায়ী দেশবিভাগের প্রশ্ন সেখানে উঠতে পারে না।

অথচ এই আদর্শ আকাশকুসুম অলীক নয়— এই আদর্শ সত্য আদর্শ। একই প্রকৃতিমাতার ক্রোড়ে মনুষ্যসমাজ এক আত্মিক যোগে কীভাবে মিলিত হতে পারে— নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই তারই প্রকৃত পথ তিনি দেখিয়েছিলেন। ভারতের ক্ষেত্রে এই আত্মিক সম্মিলন সফল হলে সমগ্র পৃথিবী তা স্বীকার করে নেবে। ভারতের দৃষ্টান্ত দেখে তখন সমগ্র জগৎ বিভিন্ন মত, আদর্শ ও স্বার্থের সমন্বয়ের মধ্যে এক পরম সমন্বয়ের পথ খুঁজে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশীযুগে বাংলা ও ভারতকে এক করতে চেয়েছিলেন— পরে তিনি আরো চেয়েছিলেন বিশ্বের আধারে বিশ্বাতীত পরম সত্যের আবির্ভাবে নিখিল মানবের ঐক্য। তিনি দিয়েছেন An ideal of human Unity —তাঁর এই চরম বাণীর মধ্যে আমরা আমাদের দেশের জাতির ও জগতের সকল সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাই।

শ্রীঅরবিন্দের চল্লিশবর্ষ ব্যাপী শিবতুল্য অধ্যাত্ম তপস্যা, যোগ সাধনা ও তাঁর দর্শন, সাহিত্য, কাব্য ও মহাকাব্য মানবের অন্তরে যে অমৃতের সন্ধান দিয়েছে, সেইদিকে আজ বিভক্ত ভারতের মানুষ উন্মুখ হোন এবং স্বাধীনতা দিবসের স্মরণ দিনে এটাই আমাদের চিত্তে অভীষ্ট প্রেরণার উৎস উন্মুক্ত করুক।

(১৫ আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

চিঠিপত্র

সৌরভ চৌধুরি অমর রহে

সুঁটিয়ার পর কুলবেড়িয়া। শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের পর ছাত্র সৌরভ চৌধুরি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হয়েছেন তাঁরা নৃশংসভাবে খুন। এদিকে সৌরভ হত্যাকাণ্ডের অভিমুখ বিপথে চালিত করতে শাসকদল মঞ্চস্থ করে এক অন্য নাটক। তৃণমূল ছাত্রসংগঠনের কিছু অর্বাচীন নেতা সৌরভকে তাঁদের সংগঠনের সদস্য বলে দাবি করেন। তবে সৌরভের দাদাই এই বিভ্রান্তির সমাধান করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর ভাই কোনো রাজনৈতিকদলেরই সদস্য ছিল না। তৃণমূলের তো নয়ই। বরং শ্যামল অবশ্যই তৃণমূল আশ্রিত ও সমর্থক। সত্য ঘটনা এই যে, সৌরভের বাবা-মা বিজেপি সমর্থক।

শাসকদলের 'সেবাদাস' পুলিশ-প্রশাসন সৌরভ খুনের খবর জেনেও ছিল 'ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে। উপরের নির্দেশ না থাকায় তারা খুনিদের ধরার কোনো পদক্ষেপ না করে চোখ বুজে ছিল। এমনিতেই সাম্প্রতিককালের তাপস পালের কুকীর্তি, সারদাকাণ্ড ও আইন- শৃঙ্খলার চরম অবনতিতে শাসকদল ও সরকার ভীষণ অস্বস্তিতে আছে। তার উপর 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপার ন্যায় সৌরভ খুনের কাণ্ড সামনে এসে পড়ায় দল ও সরকারের টনক নড়ে। অন্যদিকে সৌরভ খুনের ঘটনায় বন্‌ধ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়ায় এবং সেই ঝড় সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ায় 'ব্যাক্‌ফুটে' থাকা দল ও সরকার 'ড্যামেজ কন্ট্রোলে' নেমে পড়ে। তাদের অঙ্গুলি হেলনে পুলিশ-প্রশাসনের 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' ভাঙে। তারা নেমে পড়ে খুনিদের ধরপাকড়ে। দু'দিনে ধরেও ফেলে সবাইকে। ধরা পড়ে মূল পাণ্ডা শ্যামলও। আর এ ঘটনা প্রমাণ করে, পুলিশ তৎপর হলে কী না পারে।

এখন রাজ্যে খুনি, ডাকাত, ধর্ষক তথা সমাজবিরোধী শাসকদলের আশ্রিত হলে 'সাত খুন মাফ'। প্রতিবাদ করলেই খুন হতে হচ্ছে বা মাওবাদী তকমা দিয়ে হাজতবাস করাচ্ছে। বরুণ, অম্বিকেশ, শিলাদিত্যরা এসবের শিকার। তবু মানুষ স্বৈরতন্ত্রের প্রতিবাদ করছে, করবেও। আর সেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ধাক্কায় আবার আসবে পরিবর্তন। সৌরভ চৌধুরিদের মৃত্যু নেই। পরিশেষে বলি, সৌরভের খুনিদের চাই ফাঁসি, যাতে আর কোনো মায়ের কোনো কোল খালি না হয়।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

'ঘরশত্রু বিভীষণ'

গত ২৩ জুন, ২০১৪-র স্বস্তিকায় সম্পাদকীয়টির 'ঘরশত্রু বিভীষণ' শিরোনাম প্রসঙ্গে এই প্রতিবাদী পত্র। একটা প্রচলিত প্রবচনে পরিণত শব্দবন্ধটি একই সঙ্গে ভুল ও ক্ষতিকারক। কথাটার উৎস কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য। খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত কবি ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাভাবিকতায় হিন্দুধর্মের প্রাণপুরুষ শ্রীরাম ও অনুজ লক্ষ্মণকে তাঁর কাব্যে হেয় করে আসুরিক সংস্কৃতির রাবণপুত্র মেঘনাদকে শ্রদ্ধার ডালি অর্পণ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে কবি এই কলঙ্কবাচক শব্দবন্ধটি ব্যবহার না করলেও প্রথমে পাঠক সমাজ ও পরে বাঙালি সমাজের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণাটি গড়ে উঠেছে শ্রীরামভক্ত বিভীষণের প্রতি মধুকবির সীমাহীন অশ্রদ্ধা থেকে যা তিনি বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের রূঢ় ও পরুষ বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। দত্তকবি বলেছিলেন— ''I hate Ram and his rabbles''।

এখন, ধর্মপ্রাণ বিভীষণের প্রতি এই মানহানিকর অপবাদটির যৌক্তিকতা আলোচ্য। বিভীষণ নিজে রাজ পরিবারের মধ্যে থেকে বহিঃশত্রুর হয়ে গুপ্তচরের কাজ করেননি। পরস্ত্রী অপহরণের মতো ঘোর এক ধ্বংসাত্মক পরিণতির নিরাকরণে এবং তা একমাত্র দেশ, জাতি ও ধর্মের স্বার্থে তিনি রাবণকে সদুপদেশ দিতে গিয়ে রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যাত হন। কেবল তখনই পত্নী সরমাকে সীতার সাহায্যার্থে রেখে রামচন্দ্রের পক্ষে যোগদান করেন। রাবণের অবর্তমানে লঙ্কার রাজা হওয়ার হীন কোনো উদ্দেশ্যে নয়, কারণ রাবণকে তিনি যুদ্ধে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন।

রাবণ দিগ্বিজয়ে বের হবার সময় বিভীষণকেই রাজ্যভার দিয়ে যান, কারণ ছোট ভায়ের সততা ও ধর্মপ্রাণতায় আস্থাবান ছিলেন তিনি। ব্রহ্মার কাছে বর প্রার্থনার সময় বিভীষণ ধর্মে অচলা মতি প্রার্থনা করেন। সেরকম লোক অসৎ কাজ করতে যাবেন কেন? মানুষের মহত্তম লক্ষ্য ও দায়িত্ব ধর্ম রক্ষার জন্যই তিনি ধর্মের পক্ষে যোগ দেন। তাঁর কাজকে মধ্যম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণও যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাতের সময় সমর্থন জানান। এর সঙ্গে এও বিচার্য ভোগবাদী, অনাচারী রাবণের সংসার ভারতীয় ধর্মাশ্রিত গার্হস্থাশ্রমের সংজ্ঞার মাপকাঠিতে প্রকৃতই 'ঘর' পদবাচ্য কিনা। ধর্মহীন সংসার অসুরের ডেরা, গৃহ নয়। তাছাড়া শাস্ত্র বলছেন— ধর্মের জন্য সবকিছুই ত্যাজ্য, কিন্তু কোনো কিছুর জন্যই ধর্ম ত্যাগ করা চলে না। সেই অর্থে বিভীষণ ভারতাত্মার প্রতীক। প্রকৃত ধার্মিকের কাছে একমাত্র ধর্মই তার আত্মীয়, ধর্মহীন আত্মীয় অবশ্য পরিত্যাজ্য। বর্তমানে জাতীয় সংহতি ও দেশের অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক কিছু ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলই আক্ষরিক অর্থে 'ঘরশত্রু'। উচ্চতর ধর্ম ও সংস্কৃতির ভ্রান্ত ধারণায় খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন কবি মাইকেল যার ফলে প্রসবিত্রী হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষে ওই কাব্য রচনা। গত উনিশ শতকেই বৃটিশ শাসনকালে খৃস্টধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে ধর্ম ও জাতীয়তার বৈরিতার শুরু।

এই প্রেক্ষিতে প্রকৃত ঘরশত্রুকে আমাদের চিনতে হবে।

—**অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়,**
তারকেশ্বর, হুগলী।

দ্রাবিড় এবং তামিল নামগুলি মূলত সংস্কৃত

রাজকুমার জাজোদিয়া

সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রের সংস্কৃত সপ্তাহ পালনের বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জে জয়ললিতা। গণতান্ত্রিক দেশে তিনি বিরোধিতা করতেই পারেন। সংস্কৃত ভাষা যে অতি সমৃদ্ধ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক সময় এশিয়াটিক সোসাইটির বক্তৃতায় উইলিয়ম জোন্স সংস্কৃতকে লাতিন ও গ্রিকের চাইতেও 'অনুকরণযোগ্য' বলে রায় দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, প্রাচীন ভারতে সরস্বতী-সিন্ধু অঞ্চল থেকে আর্যরা বৃহত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। আর্য ও স্থানীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে। সেই সময় সংস্কৃত ভাষাই ছিল যোগাযোগের ভাষা। এই সূত্র ধরে ভারতের অধিকাংশ ভাষা সংস্কৃত থেকে এসেছে। আবার কিছু ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব রয়েছে। যেমন তামিল ভাষায় রয়েছে।

আমাদের ভারতে 'পঞ্চগৌড়' এবং 'পঞ্চদ্রাবিড়' নামে প্রচলিত লোকমত আছে। পঞ্চগৌড় বলতে গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, কাশ্মীর বা মিথিলা বোঝায়। গৌড় দেশের সীমানা নদী দ্বারা চিহ্নিত ছিল, সীমানায় সমুদ্র ছিল না। নদী বা স্থল বেষ্টিত ছিল। আবার পঞ্চদ্রাবিড় বলতে গুর্জর, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র ও দ্রাবিড় বোঝা যায়। এসব দ্রাবিড় দেশের সীমানায় উল্লেখযোগ্য ভাবে সমুদ্র অবস্থান করত। আমরা জানি, সমুদ্রের জলে লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। লবণ দ্রবীভূত জলকে সংস্কৃত ভাষায় 'দ্রব' বলে। এই অর্থে সমুদ্রকে 'দ্রব' রূপে চিহ্নিত করতে পারি। তাছাড়া 'সমুদ্র' শব্দে সংস্কৃত 'সমূহ' এবং 'দ্রব' শব্দ দুটি লুকিয়ে আছে। বিষয়টি নিম্নভাবে লেখা যায়। সমূহ + দ্রব □ সমূহদ্রব □ সমূদ্রব □ সমুদ্রব বা সমুদ্র □ সমুদ্রব □ দ্রব

সহজ কথায়, দ্রবের সমাবেশই হচ্ছে সমুদ্র। সংস্কৃত ভাষায় 'মিল' শব্দের অর্থ মিলে যাওয়া বা মিলিত হওয়া। সুতরাং যে দেশের সীমানা 'দ্রব' এর সঙ্গে মিলে গেছে, সে দেশই দ্রাবিড়। বিষয়টি লেখা যায় :

দ্রব + মিল → দ্রমিল
দ্রব + মিল → দ্রবিল

(১) দ্রমিল □ দ্রমিড বা দ্রমিড়। 'দ্রমিড' শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়। দ্রমিড-এর বিবর্তিত রূপ দ্রমিড়। উদাহরণ হিসেবে 'ইলা' শব্দ 'ইডা' বা 'ইড়া' হয়েছে।

(২) দ্রবিল □ দ্রবিড বা দ্রবিড় বা দ্রাবিড়।

প্রাচীন যুগে দ্রাবিড় দেশ বলতে শুধু দক্ষিণ ভারতের তামিল, কেরল, অন্ধ্র বা কর্ণাটককে বোঝাতো না, সঙ্গে পশ্চিম বা প্রায় পশ্চিম ভারতের গুজরাট ও মহারাষ্ট্রকেও বোঝাত। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দ্রাবিড় শব্দ প্রথমে ভূগোলবাচক ছিল কিন্তু পরে জাতি বা ভাষাবাচক হয়ে যায়।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, বঙ্গদেশ ও সিন্ধুদেশের সীমানায় যথাক্রমে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর রয়েছে। কিন্তু দেশ দুটি দ্রাবিড় নামে পরিচিত হলো না কেন? এ প্রসঙ্গে আমাদের উপদ্বীপীয় ভারতের (Peninsular India) কথা ভাবতে হবে। যে ভূখণ্ডের চারিদিকে জল থাকে তাকে দ্বীপ বলা হয়। আবার যে ভূখণ্ডের তিনদিকে জল থেকে তাকে উপদ্বীপ বলা হয়। ভারতের দক্ষিণাংশকে উপদ্বীপীয় ভারত বলা হয়। সমগ্র ভারতকে আড়াআড়ি উত্তর ও দক্ষিণ হিসাবে ভাগ করলে বঙ্গ ও সিন্ধু উত্তর ভারতের অংশ হবে। উপদ্বীপীয় ভারতের অংশ নয়। সুতরাং দেশ দুটি দ্রাবিড় দেশ নয়। এক কথায়, উপদ্বীপীয় ভারতই হচ্ছে দ্রাবিড় বা দ্রাবিড়দেশ।

তামিল : দক্ষিণ ভারতে রয়েছে বিখ্যাত নীলগিরি পর্বত। এই পর্বতের দক্ষিণে পরপর আনাই-মালাই, পালানি ও কউমম পাহাড়। এই পাহাড়-পর্বতগুলি তামিলনাড়ু ও কেরলের মধ্যে প্রাকৃতিক সীমানার কাজ করছে। এই সীমানার পূর্বে রয়েছে তামিল বা তামিলনাড়ু। তামিলনাড়ু ভূখণ্ডে প্রবাহিত হচ্ছে এক ঐতিহ্যবাহী সমুদ্রগামী নদী তাম্রপর্ণী। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তামিল সাহিত্যে তাম্রপর্ণী নদীর উৎস ও পাহাড়ের সৌন্দর্যের বর্ণনা বহুবার করা হয়েছে। এই নদীর তটে অবস্থান করছে তীর্থ পাপনাশন ও অম্বাসমুদ্রম্। কথিত আছে, অগস্ত্য মুনির আশ্রম এই নদীর তটেই ছিল। যতদূর মনে হয়, তাম্রপর্ণী বিধৌত অঞ্চলে তাম্রবর্ণের পর্ণ বা পাতাযুক্ত গাছ প্রচুর সংখ্যায় দেখা যেত। এই গাছগুলি অশোক বৃক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ অশোক গাছের পাতার রঙ তামাটে। প্রসঙ্গত শ্রীলঙ্কার কথা বলতে হয়। রামায়ণে অশোক বাটিকার উল্লেখ রয়েছে। সুন্দর আকর্ষণীয় পাতাগুলি তাম্রপর্ণ এবং গাছগুলি তাম্রপর্ণী নামে পরিচিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তাম্রপর্ণী বৃক্ষ অঞ্চলে প্রবাহিত নদীর নাম তাম্রপর্ণী হওয়াই যুক্তিসম্মত। আবার তাম্রপর্ণী নদী-নামের অনুকরণে সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের নাম 'তামিল' নিম্নভাবে হওয়া উচিত।

তাম্রপর্ণী □ তাম্র □ তাম্রল; শৃঙ্গ □ শৃঙ্গল □ সিংহল; বঙ্গ □ বঙ্গাল

লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, মূল শব্দের অর্থের পরিধি বাড়াবার জন্য 'ল' ধ্বনি যোগ করা হয়েছে। 'তাম্রল' ধ্বনি 'তমিল' বা 'তমিড়' হয়ে যায় স্থানীয় উচ্চারণে। তমিল নামটি ইংরেজিতে TAMIL বানানের জন্য 'তামিল' হয়ে যায়। উল্লেখ্য, তামিল ভাষায় তাম্র বা তামাকে 'তমিলরম্' বলা হয়। এক কথায়, তাম্রপর্ণী নদীর দেশই হচ্ছে তামিলনাড়ু। ■

রাঢ় বাংলার প্রাচীন শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যে বিষ্ণুপুর

প্রশান্ত কুমার মণ্ডল

ধর্মঠাকুরের থান

পর্ব—১

বর্তমানে আমরা যে জেলাকে 'বাঁকুড়া' বলি উত্তরকালে তার নাম হলো 'জঙ্গলমহল' (১৮৩৩ খৃস্টাব্দ)। অরণ্য বহুল এই এলাকায় কোনো পথঘাট ছিল না। ছিল না এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াতের কোনো সহজ মাধ্যম। আর ভয় ছিল ডাকাত দলের এবং বন্য পশুদের হিংস্র আক্রমণের। এই ভাবে ভয়ে ভয়ে যেতে হোত হেঁটে। কখনো চড়াই বা কখনো উৎরাই, কখনো বা অনেক ঘুর পথে। এই জেলাকে নিয়ে কিংবদন্তী আছে--- ধর্মঠাকুর 'বাঁকুড়া' রায়ের নামানুসারে এই জেলার নাম 'বাঁকুড়া'।

তা যাই হোক না কেন, বৃটিশ আমলের পূর্বে এক হাজার বৎসরকাল মল্লরাজারা রাজত্ব করেছেন। সেই জন্য এই নিয়েও অনেক মতবাদ আছে। অনেকে বলেন রাজার বাগ্‌দি ও মাল জাতীয় পদবি বলে— 'মাল থেকে মল্ল' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। আবার মল্লরাজবংশের কুল পরিচিতি নিয়েও নানান মতবাদ রয়েছে। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্তের মতে— 'রাজারা সিংহ' উপাধি গ্রহণ করার আগে নিজেদের আর্যাবর্ত মল্ল বলে মনে করতেন'। আর ক্ষত্রিয় গুণাবলীর সিংহ উপাধিটি পাওয়া সম্পর্কে কলকাতার তৎকালীন গভর্নর ওয়েল বলেন— 'গোপাল সিংহ রাজপুত ব্রাহ্মণ ছিলেন, ১৬২২ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ মল্লসিংহ উপাধি গ্রহণ করেন।' হান্টার সাহেব বলেন— 'গোপাল সিংহ মল্লরাজবংশের একটি ইতিহাস রচনা করেন তাতে ৫৫ জন রাজার নাম উল্লেখ আছে'।

অনেক মতান্তর থাকলেও ১৮৮১ খৃস্টাব্দে রূপ নেয় 'বাঁকুড়া' নামে। এই জেলার দক্ষিণে মেদিনীপুর, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চল, পূর্বরাঢ় ভাগীরথীর ক্রম নিম্ন সমভূমি, উত্তর রাঢ় বীরভূম, মধ্যে বাঁকুড়া অবস্থিত বলেই বাঁকুড়া হলো মধ্য রাঢ়।

বাঁকুড়া জেলার অন্যতম মহকুমা শহর বিষ্ণুপুর ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক পর্যটন কেন্দ্র যা কলকাতা থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। রেল যোগে বা বাস যোগে এখানে অনেক পর্যটক ভ্রমণ করতে আসেন। বাঁকুড়া শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার বাস বা রেল পথে বিষ্ণুপুর স্টেশনে যাওয়া যায়।

এখানের মন্দিরগুলির অলঙ্করণ টেরাকোটা— মূলত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুপ্রেরণায় নির্মিত বৈষ্ণব মন্দির। এই রাঢ় অঞ্চলের মল্লভূম রাজত্বকালে প্রাচীন শিল্পের জোয়ার বয়ে গিয়ে বিষ্ণুপুরকে যে ভাবে উজ্জীবিত করেছিল তা অবর্ণনীয়— সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, রাজনীতির অঙ্গনও এক সময় যেভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিল তা কোনোক্রমেই উপেক্ষা করার বিষয় নয়। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য তথা হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য বেদ, গীতার সারতত্ত্বগুলিকে কেন্দ্র করে বিশ্বাসী জনমত বিষ্ণুপুরকে আরও ঐতিহ্যমণ্ডিত করেছে। তাই রাঢ় বঙ্গভূমির অন্যতম লাল কাঁকুরে মাটির শহর বিষ্ণুপুর আজও পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণবাচার্য 'শ্রীনিবাসের' আগমন মল্লরাজ 'বীর হাম্বিরের' বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষাকে কেন্দ্র করেই। মল্লরাজ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবে মল্লরাজ পরিবারে বিপুল বিদ্যা চর্চা এবং চিন্তার প্রসার ঘটেছিল। তাছাড়া বহু ব্যবসায়ী এবং জ্ঞানীগুণীজনের সমাবেশ যেভাবে এই নগরকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুর আগমন এবং নগরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এক গ্রামের রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাবতী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বিষ্ণুপুরের গৌরব বৃদ্ধি করে। বিষ্ণুপুরের খড় বাংলা মহল্লায় তৈরি হয়

'শ্রীনিবাসের' স্থায়ী ভবন। তাঁর আদি নিবাস ছিল নবদ্বীপের নিকটবর্তী 'চাকন্দি' নামক গ্রামে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এই শ্রীনিবাস আচার্যের কাছ থেকে মল্লরাজা ভাগবত পাঠ শুনেছেন। এমন একটি টেরাকোটার নিদর্শন মদনমোহন মন্দিরের প্রবেশদ্বারে আছে যা নিশ্চিতভাবে বৈষ্ণব ধর্মানুযায়ী মন্দির নির্মাণের নির্ভুল প্রমাণ।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিষ্ণুপুরে ছিল অসংখ্য টোল ও চতুষ্পাঠী। লেখা হয়েছে অনেক মূল্যবান পুঁথি, যা কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর অমূল্য সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত আছে। এছাড়া মার্গ সঙ্গীতে গৌড়ীয় রীতির এক বিশেষ অবদান ছিল। গৌড় মল্লার রাগ বা তার নিদর্শন, পরবর্তীকালের বিষ্ণুপুর ঘরানা ও মুর্শিদাবাদ ঘরানা আজও প্রাণবন্ত।

মন্দিরগাত্রের টেরাকোটা

এই ঘরানার যদুভট্টের নাম উল্লেখযোগ্য। যাঁর পুরো নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য। এই বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট শুধু সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন না, গীতিকার ও সুরকার ছিলেন। ১৩৭০ খৃস্টাব্দে এই বিষ্ণুপুর ঘরানা শুরু, তিনিই বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদী ঘরানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এই ঘরানায় তালিম নিয়েছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ, আলি আকবর খাঁ, হাফিজ খাঁ থেকে রবিশঙ্কর, আমজাদ আলি খাঁ-র মতো শিল্পীরা। তখন মল্লরাজ ছিলেন দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ। বাহাদুর খাঁ দিল্লী ছেড়ে হাজির হন বিষ্ণুপুরে। তাঁরই নামাঙ্কিত বাহাদুরগঞ্জ বলে একটি এলাকার নামকরণ আজও স্মৃতি বহন করে। এই বাহাদুর খাঁর প্রধান শিষ্য ও অন্যতম সঙ্গীতাচার্য গদাধর চক্রবর্তী যিনি মল্ল রাজসভার গায়ক ছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্যই রামশঙ্কর ভট্টাচার্য।

সঙ্গীতে পারঙ্গম যদুভট্ট একদিন মাত্র সময় নিয়েই সেই রাগের ছায়ায় নিজের একটি গান রাজসভায় পরিবেশন করেন। রাজা বীরচন্দ্র যদু ভট্টকে 'তানরাজ পঞ্চকোট রাজ রঙ্গনাথ' উপাধিতে ভূষিত করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন— 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কয়েক বৎসর ধরিয়া যদুভট্টের নিকট গান শিখিতেন।' বন্দেমাতরম্-এর প্রথম সুরকার যদুভট্টই।

বর্তমান বিষ্ণুপুরের পাড়া-মহল্লায় ওই ঘরানার সঙ্গীতানুরাগীদের সঙ্গীত শিক্ষার রেওয়াজ শোনা যায়। আনন্দের কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওই বিষ্ণুপুর ঘরানার সংরক্ষণেও বিভিন্ন পন্থা নিয়েছে।

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা ও পুরাকীর্তি আলোচনা করতে গিয়ে বলা যায় প্রায় এক লাখ টেরাকোটা সম্বলিত ৩৫০টিরও বেশি দেবালয়ের মধ্যে ২৫-২৬টি মনোরম মন্দির, গড়, রাজপ্রাসাদ, বাঁধ (পুষ্করিণী), পাথরের দরজা বিভিন্ন স্থানে প্রায় ভগ্নপ্রায় বা বিলীয়মান।

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার অপরূপ মন্দিরগুলি (১৬৪৩-১৬৯৪) খৃস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়। বিষ্ণুপুর ছাড়া বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও চোখে পড়ে। টেরাকোটার পর্যায়ে শুধু মন্দির নয়, প্রাচীন রাজ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আজও টিকে থাকা কতকগুলি গম্বুজ শীর্ষ, অট্টালিকা গঠনে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের মোগল প্রভাবিত রাজপুত স্থাপত্যশৈলীর সাক্ষাৎ মেলে। আরও লক্ষণীয় বিষয়, দশাবতারের ছবিগুলির গঠন, পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয় ইত্যাদি ওড়িশার হিন্দুরীতি অনুযায়ী হলেও পার্শ্বের সহচর মূর্তির বেশভূষা মোগল যুগের নিদর্শন। উত্তর ভারতের স্থাপত্য ভাস্কর্য আর চিত্রকলার গভীর প্রভাব সপ্তদশ শতকের বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন শিক্ষাশৈলীকে স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত করেছে।

বাঁকুড়ার মল্লরাজাদের প্রয়াসে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মন্দির, গড়, চালা নির্মাণশৈলী বিকশিত হয়েছিল। মল্ল রাজপরিবারে যে বিপুল বিদ্যা চর্চা এবং চিন্তার প্রসার ঘটেছিল— তা নিঃসন্দেহে বিস্ময় সৃষ্টি করে। এই রাঢ়ভূমি বিষ্ণুপুরে ১৩৭০ খৃস্টাব্দের পর সঙ্গীত বিদ্যার প্রচলন ঘটে। এমনকী দিল্লী থেকে তানসেনের বংশধর বাহাদুর খাঁ-কে মল্লভূম রাজ বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। তাছাড়া মল্ল রাজপরিবারে বৈষ্ণবধর্মে ও সাহিত্যে যে প্রবল উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল— এ প্রসঙ্গে রাজ্য বীর হাম্বিরের পদটি উল্লেখ করা যেতে পারে—

'শাশুড়ী-ননদে মোর সবাই বাসরে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়
এ বীর হাম্বির চিত্ত শ্রীনিবাস অনুগত
মজিগেলা কাঁলাচাঁদ পায়।'

এককথায় মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার সূচনা হয় বাঁকুড়ায়। শুধু যে মন্দির তা নয়, ছোট ছোট অসংখ্য টেরাকোটার টালিগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজার হাজার বছরের সাধনার বিরল এক অমোঘ কীর্তি, যা থেকে তৎকালীন হিন্দুসংস্কৃতির প্রকৃত রূপরেখাই পরিস্ফুটিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই জেলার 'শুশুনিয়া' পাহাড়ের গাত্রে উৎকীর্ণ আছে চন্দ্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক চন্দ্রবর্মার লিপি যা বিষ্ণুপুরের শিল্প সাধনার একটি অন্যতম জীবন্ত সাক্ষী। তাছাড়া সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতির কথাও আমরা জানতে পারি। এই বিষ্ণুপুর শহর তামাক সেবনেরও প্রচুর সাক্ষ্য রেখেছে। বিষ্ণুপুর এই বঙ্গের মধ্যে তামাক প্রস্তুতের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত অম্বরী তামাক মোগল সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহের সঙ্গে বিষ্ণুপুর রাজদরবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেরই আভাস দেয়।

বিষ্ণুপুরের এই অনবদ্য মন্দিরগুলির গঠনশৈলীর পশ্চাতে মল্ল রাজপরিবারের বৈষ্ণবধর্ম নিয়ে বিপুল উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল। বিষ্ণুপুর

মল্লরাজ্যে বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাসের আগমন এবং মল্লরাজধানীর তৎকালীন রাজা হাম্বির মল্ল বা বীর হাম্বির ভগবৎপাঠ শ্রবণ করে বৈষ্ণবধর্মে আপ্লুত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। এই মল্ল রাজের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম দীক্ষাকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিস্তারলাভ হয়েছিল। রাজার এই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের উৎসাহ অনুভব করে মল্লভূম রাজ্যবাসীরা দলে দলে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হতে লাগলেন। ১৫৯১-১৬১৬ খৃস্টাব্দে ভাগবৎ প্রেরণায় নতুন বলকারক আবহাওয়ার এক অপূর্ব সাংস্কৃতিক জোয়ার এসে পৌঁছল মল্লভূমের গ্রামে গ্রামে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, ধর্মচর্চায়, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে বিষ্ণুপুরের কৃষ্টি গগন মুখরিত হয়ে উঠল।

বিষ্ণুপুর মল্লরাজধানীকে আগ্নেয়াস্ত্রে বলীয়ান করার জন্য যিনি নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার প্রবলভাবে মল্লসেনাদের উৎসাহিত করে এক নজির সৃষ্টি করেন তিনিই রাজা ধাড়িমল্লের (৮৭১ খৃস্টাব্দ) হাম্বির মল্ল বা বীর হাম্বির। ১৫৬৫ খৃস্টাব্দে মতান্তরে ১৫৮৭ খৃস্টাব্দে বিষ্ণুপুরের উত্তর সীমান্তের যে প্রান্তে দাউদ খাঁর সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, সেই স্থানটি যুঝঘাঁটি বা 'দায়ুদঘাঁটি' বর্তমানে অপভ্রংশ হয়ে দেজহাট নামে পরিচিত। হাম্বির মল্ল বা বীর হাম্বির ছিলেন রাজনীতিবিদ্ ও সুদক্ষ যোদ্ধা এবং বাংলার বার ভুঁইয়াদের অন্যতম। তাঁরই নির্দেশে তৎকালীন শিল্পী জগন্নাথ কর্মকারদের দিয়ে 'দলমাদল' কামান তৈরি করানো হয়।

বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী রাণীসাগর, বর্তমানে 'রামসাগর'-এর নিকট তৎকালীন গৌড়ের নবাব সোলেমান কুরবানীর নির্দেশে তাঁর পুত্র দাউদ খাঁ প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে আচমকা আক্রমণ করেন। হাম্বিরমল্ল প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং রণকৌশলে দাউদ খাঁকে পরাজিত করেন। দাউদ খাঁ তাঁর বীরত্বে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নাম দেন 'বীরহাম্বির'। এই রাজার রাজত্বকাল (১৫৬৫—১৬২৫ খৃস্টাব্দ)।

তারপর পরবর্তী রাজা রঘুনাথ সিং ১৬১৬—১৬৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রাজাকে বলা হয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বৃন্দাবন ধামের জয়নগরের এক রাজকুলের সন্তান বলে মনে হয়। কথিত আছে— ওই রাজা পুরীতীর্থে যাওয়ার পথে বিষ্ণুপুর রাজ্যে গভীর অরণ্যে তাঁর মহিষী এক সন্তান প্রসব করেন। ওই সদ্যোজাতকে নিয়ে ভ্রমণ করতে অসুবিধা হবে ভেবে সেই অরণ্যে শিশুটিকে পরিত্যাগ করেন। অবশেষে এক বনবাসী শিশুটিকে কুড়িয়ে পেয়ে শিশুটিকে প্রতিপালন করে। যখন ওই শিশুর বয়স ৭ থেকে ৮ বৎসর তখন এক বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ রাজোচিত কুললক্ষ্মণ আবিষ্কার করে তাকে নিজ গৃহে নিয়ে যান। অল্পদিন পরে স্থানীয় ওই বনবাসী রাজার মৃত্যু হলে ব্রাহ্মণ রঘুকে সঙ্গে নিয়ে শ্রাদ্ধবাসরে যান। তখন আহারাদি চলছে। ওই মৃতরাজার প্রধান হাতিটি রঘুকে শুঁড় দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। এই ঐশ্বরিক ঘটনা দেখে সবাই আশ্চর্য হয় এবং ঘটনাটি ভগবান ঈঙ্গিত বলে প্রচার পায়। এইভাবে প্রথম ক্ষত্রিয় রাজা স্বীকৃত হন 'রঘুনাথ সিংহ'। ১৮৮২ খৃস্টাব্দ। কলকাতা রিভিউ-এ ড. রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেনে— ''বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজারা দাবি রাখে যে— তাদের রাজবংশের উৎপত্তিকাল সেই সময় যখন দিল্লীতে হিন্দুরাজারা সমাসীন ছিলেন। তখন ভারতে মুসলমানদের নামগন্ধও ছিল না। পরে বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের প্রবর্তনেও বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতাপের কোনোরূপ তারতম্য হয়নি।''

বর্ধমান, বীরভূমের রাজবংশ ও মুর্শিদাবাদের সুবাদারেরা যে ভাবে অবিচার করেছে— বিষ্ণুপুর সেভাবে পার্শ্ববর্তী রাজাদের অবিচার করেনি বরং বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূম রাজ্য বাংলার সাংস্কৃতিক চর্চার স্থান অনায়াসেই স্থান দখল করে নেয়। বিভিন্ন মন্দির ও স্থাপত্যগুলির মধ্যে কেবলমাত্র রাধেশ্যাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালকে ১৬৮০ শকাব্দ যে ১৭৬৪ মল্লাব্দের সমার্থক একথা উৎকীর্ণ আছে। স্বভাবতই রাঢ়ভুমি বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের বিভিন্ন কীর্তি আজও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খুব আনন্দের কথা বর্তমানে ভারত সরকারের পুরাকীর্তি রক্ষা বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে বেশ কিছু মন্দির। ■

মল্লরাজাদের বিখ্যাত দলমাদল কামান।

চিরদিনের পরামর্শ

নবাঙ্কুর

কথা কম, কথা বেশি

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের একটা মস্ত বড় দোষ, আমরা বেশি কথা বলি। এবং তার চেয়েও বড় দোষ হলো, সর্বদাই নিজের কথাই বলি। এটা একটা মস্ত বড় বদ্-অভ্যাস। ছেলেবেলা থেকে সজাগ না হলে, কিছুতেই এই বদ-অভ্যাসের সংশোধন করতে পারবে না। জেনে রেখো, জীবনে উন্নতি করতে হলে, লোকের প্রিয় হতে হলে, তোমাকে হতে হবে আদর্শ শ্রোতা।

যে-লোকের সঙ্গে দেখা হবে, যে-লোকের সঙ্গে আলোচনা করবে, সর্বদা তাকেই প্রথম কথা বলতে সুযোগ দেবে। তার কথা মন দিয়ে শুনবে। কখনো তার কথার ওপর কোনো কথা বলবে না, যতক্ষণ না তার বক্তব্য শেষ হয়, ততক্ষণ ধৈর্য ধরে তোমাকে শ্রোতা হয়ে থাকতে হবে।

প্রতিদিনের জীবনে এই অভ্যাস যে কত প্রয়োজনীয় তা যখন বড় হয়ে সংসারে প্রবেশ করবে তখন বুঝতে পারবে। মনে রেখো এ পৃথিবী বক্তাকে চায় না, শ্রোতাকে চায়। এ একটা মস্ত বড় আর্ট। এবং এই আর্ট মহাত্মা গান্ধী এত ভালো করে জানতেন যে, তাঁর সামনে কেউ জয়ী হয়ে ফিরতে পারতো না। অথচ তিনি প্রথমে নিজের কথা বলতেন না। অপর লোককে তিনি প্রচুর অবকাশ দিতেন তার বক্তব্য বলবার, তারপর তার কথাতেই তাকে তিনি পরাজিত করতেন।

মানুষের সঙ্গে কথা বলা জীবনে একটা মস্ত বড়ো আর্ট। এবং এই আর্টে সিদ্ধিলাভ করবার গোড়ার সূত্র হলো অপরের কথা শোনবার অভ্যাস শিক্ষা করা। আমাদের তর্ক প্রায়ই নিষ্ফল হয়, এ তো দেখেছ? তার কারণ আমরা তর্ক করতে শুরু করেই অপর পক্ষকে কথা বলার অবকাশ খুব কমই দিই। তার ফলে সে রেগে যায়। সে উল্টে আমাকে কথা বলার অবকাশ দিতে চায় না। তার ফলে আমিও ভেতরে ভেতরে রেগে যাই। সুতরাং তার ফল দাঁড়ায় একটা মানসিক তিক্ততা। তর্কে জয়ী হবার একমাত্র কৌশল তর্ক না করা।

জীবনে যতরকম সংযম আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংযম হলো বাক্-সংযম। এই বাক্-সংযম ছেলেবেলা থেকেই আমাদের অভ্যাস করা উচিত। তুমি জান, মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনে প্রতি সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকতেন। ভারতবর্ষে তাঁর কথারই সবচেয়ে বেশি দাম ছিল, তাই তাঁকে রীতিমত বাক্-সংযম অভ্যাস করতে হয়েছিল। যত প্রয়োজনই থাকুক না কেন, তিনি মৌনব্রত ভাঙতেন না।

নিজেদের বন্ধু-বান্ধব মহলে আজ থেকে এই অভ্যাস শুরু করতে পারো। তিন-চারজন বন্ধু মিলে তোমরা ঠিক করলে, একটা নির্দিষ্ট দিনে তোমরা কোনো কথা উচ্চারণ করবে না। যে কথা বলে ফেলবে, কথা পিছু তাকে ফাইন দিতে হবে। এতে মজাও অনেক পাবে। এবং মজার মধ্যে দিয়ে দেখবে জীবনের এক অতি প্রয়োজনীয় অভ্যাস গড়ে উঠেছে।

ভারতচন্দ্রের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। আমাদের দেশের একজন মস্ত কবি ছিলেন তিনি। তিনি এই সম্পর্কে একটা খুব দরকারি কথা লিখে গিয়েছেন, 'যে কহে বিস্তর, সে কহে মিছা বিস্তর।'

সংকলন : কৌশিক গুহ
ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

পুবালি-পুষ্পল বইকে যত্ন করতে শিখেছে

বইকে যত্নে রাখতে হয়—সেটা শিখে গেছে পুবালি আর পুষ্পল। বইকে ভালোবাসতে শিখেছে। আগে দেখতো নানারকম বই। ছবি দেখে মজা পেত। মাকে জিগগেস করতো কি লেখা আছে। মা কাজের ফাঁকে বলে দিতো। বাবা নতুন নতুন গল্প বলতো। রামায়ণ মহাভারতের কত গল্প শুনেছে। পঞ্চতন্ত্রের গল্প, জাতকের গল্প। একই গল্প দুবার তিনবার শুনতো। বাড়ির কাছে বইমেলা হয়েছিল কিছুদিন আগে। ওরা মায়ের সঙ্গে গিয়ে পছন্দ করে বই কিনেছে। সেই বইগুলো পড়ার পর যত্নে রেখেছে। বাবা বলেছে, 'বই কখনও পুরনো হয় না। ফিরে ফিরে পড়তে হয়।' ছোটবেলায় পড়া বই বাবা যত্নে রেখেছে। মাঝে মাঝে খুলে দেখে। সেসব বইয়ের কিছু লেখা এখন পুবালি পুষ্পলও পড়ে। লেখাগুলো মনে কত ছবি তুলে ধরে। ওরা দুজনেই গান নাচ আবৃত্তি আঁকা নাটক শেখে। খুব মজা আছে তার মধ্যে। বাড়ির বইগুলো ওদের সঙ্গ দেয়। দুজনে খেলাধুলোও করে। শুধু খাওয়ার সময় একটু মুশকিল হয়। খেতে ইচ্ছে করে না। আসলে দোকানে কিছু খাবার জিনিস সাজানো থাকে, সেগুলো ওদের বন্ধু-বান্ধবরা নেয়। ওদের মা-বাবা বারণ করেন। বাড়িতে তৈরি খাবার দেয় মা টিফিন কৌটোয়। খিদে পেলে দুজনেই খেয়ে নেয়। তবু মা জিগগেস করে, 'টিফিন খেয়েছিস তো?'

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. ভারতের সবচেয়ে বড় রাস্তা কি? কোথা থেকে কোথায়?

২. ভারতীয় রেল বিশ্বে কত নম্বর স্থানে রয়েছে?

৩. ভারতের সব থেকে দীর্ঘ রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম কোথায়? কত বড়ো?

৪. ভারতে কোন্ কোন্ মাপের রেলপথে গাড়ি চলে?

৫. ভারতে প্রথম ট্রেন চলেছিল কবে? কোথা থেকে কোথায়?

উত্তর : ১. এন এইচ (জাতীয় সড়ক)। বারাণসী থেকে কন্যাকুমারিকা। ২. চতুর্থ। ৩. গোরখপুর। টানা ১.৩ কিলোমিটার। ৪. ব্রডগেজ, মিটার গেজ, ন্যারো গেজ। ৫. ১৬ এপ্রিল ১৯৫৩। বোম্বে থেকে থানে।

ছবিতে তফাত খোঁজ

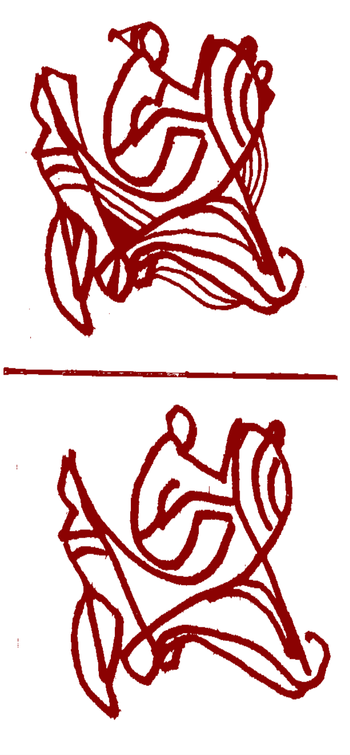

চিরদিনের পাঠ

অল্পতে খুশি হবে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অল্পেতে খুশি হবে
দামোদর শেঠ কি।
মুড়কির মোয়া চাই,
চাই ভাজা ভেটকি।।

আনবে কটকি জুতো
মটকিতে ঘি এনো,
জলপাইগুড়ি থেকে
এনো কই জিয়োনো,
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে
বোয়ালের পেট কি।

চিনে বাজারের থেকে
এনো তো করমচা,
কাঁকড়ার ডিম চাই
চাই যে গরম চা,
না হয় খরচা হবে
মাথা হবে হেঁট কি।

মনে রেখো বড়ো মাপে
করা চাই আয়োজন,
কলেবর খাটো নয়—
তিন মোন প্রায় ওজন।
খোঁজ নিয়ো বাজারেতে
জিলিপির রেট্ কী?

অঙ্গনা

শিক্ষাই পারে নারীসমাজকে শক্তিশালী করতে

শুভশ্রী দাস

বর্তমান সময়ে মুখে বলা হচ্ছে ছেলে মেয়ে দুই সমান। উদার হৃদয় কোনো বাবা-মা সত্যি সত্যি এ ব্যাপারে কোনোরকম ভেদাভেদ করেন না, কিন্তু সার্বিকভাবে মহিলাদের অলিখিতভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক রূপেই দেখতে অভ্যস্ত দেশের পুরুষ সমাজ। মহিলাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক রূপে সশক্ত করার কথা পুরুষরা ভাবতে পারেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রেও মহিলারা মাত্র ১১ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করছেন। সুতরাং সামগ্রিকভাবে মহিলাদের যতক্ষণ সামাজিক ভাবে সশক্ত করা হচ্ছে না, ততক্ষণ আইনি অধিকারগুলির ঠিকভাবে উপযোগ হতে পারে না।

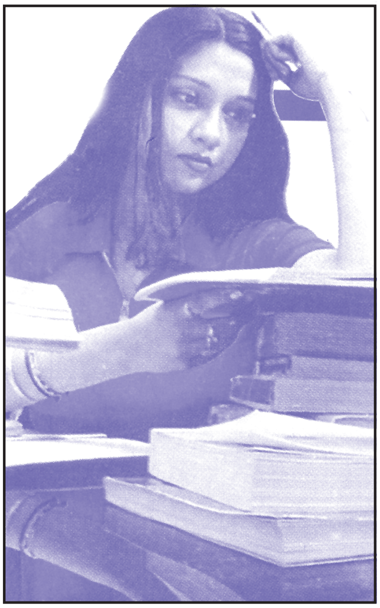

সামাজিক অধিকার অথবা সমানতা এক জটিল প্রক্রিয়া। কোনো কোনো প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সামাজিক সমানতার স্থিতিকে কখনো অস্থির করে তোলে। ফলে সামাজিক বিকাশই ব্যাহত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, মহিলাদের সামাজিকভাবে সশক্ত বানানোর উপায় কি হতে পারে? এর উত্তর খুবই সরল কিন্তু লক্ষ্য কঠিন। শিক্ষা এমন একটা উপযোগী অস্ত্র যা সামাজিক বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। সেই কবে মধ্যযুগে আমাদের সমাজের মেয়েদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখা শুরু হয়েছিল, পুরুষশাসিত সমাজ আজও সেই বন্ধন শিথিল করেনি। সে কারণে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই কম। বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং স্বাভাবিক সামাজিক বিকাশের কারণে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। এজন্যই স্ত্রীশিক্ষাকে বাইরে রাখা সম্ভব হয়নি। সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপে শিক্ষাকে কেবলমাত্র প্রাথমিকতা দেওয়ার কথা কাগজে কলমে রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রয়াস খুব একটা করা হয়নি। অনেক সরকারি ও বেসরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মহিলা সাক্ষরতার হার খুবই কম। প্রাথমিক স্তরে এখনো পরিস্থিতি খুবই বিষম। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে প্রচেষ্টাগুলি চলছে তাতে বালিকাদের জন্য অনুকূল স্থিতি নির্মাণের কোনো ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার সংখ্যা কম এবং বালিকাদের জন্য আলাদা শৌচাগার না থাকায় বিপরীত প্রভাব পড়ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বালকদের তুলনায় বালিকাদের স্কুলছুটের হার বেশি। এক কথায় প্রাথমিক স্তরে পুরো শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই অনেক খামতি আছে।

সরকারি ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী না থেকেও সমাজে পরিবর্তন আনা যায়। এজন্য অভিভাবকদের সচেতনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বাড়ির কন্যাসন্তানকে শিক্ষার সুযোগ দিলে সেও পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে। পশ্চিমবাংলায়ও অনেক পিছিয়েপড়া পরিবারের কন্যা পড়াশুনায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। পরিবারের একটি মেয়ে শিক্ষিতা হওয়ার ফলে তাদের সমাজে সে প্রেরণাস্বরূপ হয়েছে, তার উদাহরণ— উত্তরবঙ্গের টোটোপাড়ার এবারের গ্র্যাজুয়েট শোভা টোটো। শোভার প্রেরণা তাঁদের সমাজের সঞ্চিতা টোটো— মেয়েদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট। এঁরা দুজনেই কলকাতায় ডব্লিউ বি সি এস-এর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও শোভারা প্রমাণ করে দিচ্ছেন তাঁরা ছেলেদের থেকে কোনো অংশে কম নন। টোটো কল্যাণ সমিতির সম্পাদক বকুল টোটোর কথায়— "মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ বাড়ছে এ অত্যন্ত খুশির খবর। এর ফলে আমাদের সমাজ আর পিছিয়ে থাকবে না।"

সমাজ চেতনা জাগ্রত করে মেয়েদের যদি শিক্ষিত করা যায় তাহলেই শক্তিশালী সমাজ গড়ে উঠবে এবং নারীসমাজও হবে শক্তিশালী। পশ্চিমবঙ্গের ১৩ জন মহিলা এবার আইন সভায় গিয়েছেন। তাঁরা অন্তত প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষক হার বৃদ্ধির দিকে নজর দিন যাতে বাঙালি মেয়েরা কোনো অংশেই পিছিয়ে না থাকে। ■

সবার প্রিয়
®
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

অতিথি কলম

জাপান-ভারত যৌথ উদ্যোগে দেশের ক্ষতি নেই

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের উৎপাদন ও আমদানি এই দুই ক্ষেত্রেই সরকারি পদক্ষেপ কি নেওয়া হবে, পরিকল্পনার অভিমুখই বা কোনদিকে যাবে তা কিন্তু কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে চলেছে। এখন আমাদের দেশীয় উৎপাদন ও আমদানির অনুপাত ২৮ : ৭২ অর্থাৎ দেশে ২৮ শতাংশ সরঞ্জাম তৈরি হয়, ৭২ শতাংশ অনিশ্চিত ডলার মূল্য সাপেক্ষে আমদানি করতে হয়। এর ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক সমরাস্ত্র ব্যবসায়ীদের বজ্রমুষ্টি আমাদের দেশের ওপর চেপে বসেছে। তাদের কাছে আমরা এক শাঁসালো মক্কেল।

এখন সদ্য ক্ষমতায় আসা সরকারের কিন্তু ঘোষিত নীতি— এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সামরিক সম্ভারের ক্ষেত্রে দেশীয় অস্ত্র নির্মাণের এক নিপুণ পরস্পর সমন্বিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্যোগ গড়ে তোলা। যারা নিরপেক্ষভাবে দেশের সম্পূর্ণ না হলেও গরিষ্ঠাংশ প্রয়োজন মেটাবে। এটি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে এককালীন প্রচেষ্টা নয়। বরাবরের চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটিয়ে চলার প্রয়াস বলেই নীতিগতভাবে ঘোষিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থা যে ক্রমিক অবনতির মুখে পড়েছে তাতে আমাদের পড়শী দেশগুলি এক প্রকার সুবিধেই পেয়েছে। আমরা যতদিন আমাদের নীতি নির্ধারণে দোটানায় কালক্ষেপ করেছি তারা নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে। আজ তারা অনেকটাই সুবিধেজনক অবস্থায়, পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা যথেষ্টই অস্বস্তিদায়ক বা কাঙ্ক্ষিত শক্তিশালী নয়।

> “জাপানের প্রতিরক্ষা শক্তি অস্ত্রসম্ভারের নিরিখে এশিয়ার মধ্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন। জাপানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসম্ভার নির্মাণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নয় সামরিক শক্তির ঘন ঘন আধুনিকীকরণ করাও। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গড়ে এখানে এসে অস্ত্র নির্মাণ ভারতের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধেজনক ও লাভদায়ী প্রকল্প হওয়ার উপযুক্ত।”

অতীত অবস্থান :

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই বিশেষ করে ৫০-এর দশকে স্বাধীন ভারতীয় নেতৃত্ব বৃটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান অস্ত্র-ব্যবসায়ীদেরই মুখাপেক্ষী ছিল। ৬০-এর দশক থেকেই প্রাচ্য- পাশ্চাত্যের চিরকালীন কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক দোলাচলে ভারত রাশিয়ার (তৎকালীন ইউ এস এস আর) সঙ্গে সামরিক সম্পর্কের শুরু করে। ১৯৭১-এর পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ভারতের সামরিক সম্ভার সংক্রান্ত আমদানি নীতি নাটকীয়ভাবে রাশিয়া নির্ভর হয়ে পড়ে। পরিণতিতে তৎকালীন সোভিয়েতই হয়ে ওঠে ভারতে অস্ত্র সরবরাহের একচেটিয়া কারবারি ও ভারতের অস্ত্র ভাণ্ডারের পূর্ণ নিয়ামক। এটা জানা খুব কঠিন নয় যে কোনো একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই নানান কুফল থাকে। চাইলেই অস্ত্র পাওয়া যাবে, কেননা সরবরাহকারী ২৪×৭ ঘণ্টাই তাদের দোকান খোলা রেখেছে— এই ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতাই দেশকে অস্ত্র-সরঞ্জাম নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চিন্তাই করতে দেয়নি। শুধু তাই নয়, সোভিয়েত রাশিয়া কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভারতের ত্রাণকর্তা ও ঘোষিত মিত্র হওয়ায় ভারতের নিশ্চেষ্ট হয়ে পরনির্ভর থাকাটা কখনই অগৌরবের মনে হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ ভারতীয় যুদ্ধ-বিমানের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থান এরোনট্রিকস সম্পূর্ণ একচেটিয়া (সরকারি পরিচালনাধীন) উৎপাদনের অধিকারী সংস্থা হয়েও খুব একটা সুবিধে হয়নি। ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষে বারবার অভিযোগ জানানো হয়েছে যে টেকনোলজি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে তারা কোনো সুবিধে পায়নি।

আজকের পরিস্থিতি :

প্রশ্ন উঠছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের আমদানিকারক হয়েও দেশ কীভাবে সুপার পাওয়ার হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে পারে? এই

পরিস্থিতি থেকে কি আদৌ বেরনো সম্ভব? একা দেশের খরচে ২৮ : ৭২ এর অনুপাতের ঘাটতি মেটাতে যে গগনচুম্বী খরচ পড়বে তা বহন করার ক্ষমতা দেশের নেই। এর আংশিক সমাধান রয়েছে যৌথ উদ্যোগের রাস্তা ধরলে। ভারত ও জাপানের মধ্যে সে অর্থে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কের বাইরে গিয়ে দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগই পথ হতে পারে।

প্রসঙ্গত ভারতের সাবমেরিনের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কমে গেছে যার তৎকালভিত্তিক সমাধান জরুরি। দু'টি জাপানি সংস্থা মিতসুবিসি ও কাওয়াসাফীর কাছে ১৯৯০ সালের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি ২০টি সাবমেরিন আছে। এগুলি জাপানের নৌ-সেনারা প্রয়োজনে কাজে লাগায়। জাপানিরা চিরাচরিতভাবেই খরচ ও পণ্যের গুণগত মান সচেতন। তারা কোনো সময়ই দীর্ঘসূত্রতার ফলে খরচ বেড়ে যাওয়া ও নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প শেষ না করতে পেরে আন্তর্জাতিক বাজারে বদনাম কিনতে রাজি নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতের কোনো জাহাজ তৈরির কারখানায় তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নৌ সম্ভার তৈরি শুরু করলে ভারতের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কেবল জাপানই বা কেন? অন্য কোনো দেশ কেন নয়? এর উত্তর হলো এই যে— ভারত দীর্ঘদিন ধরেই নানান পাশ্চাত্য নৌ-বাহিনী যেমন বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, রাশিয়া, ইজরাইল, ইউক্রেন, পোল্যান্ড বা আমেরিকার কাছ থেকে নৌ-বহর সংক্রান্ত সরঞ্জাম আমদানি করে আসছে। কিন্তু জাপানের সঙ্গে কিছুই করেনি।

পরিতাপের বিষয়, ভারত কিন্তু গত ত্রিশ বছর ধরে ভারতের পরিবহণ ক্ষেত্রে অসাধারণ জাপানি প্রযুক্তির সফল ব্যবহার দেখতে অভ্যস্ত রয়েছে। যেমন কয়েকটি বিখ্যাত জাপানি কোম্পানি সুজুকি, ইসুজু, হন্ডা, নিশান, মিতশুবিসি, টয়োটা প্রভৃতিরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা করে আসছে। গাড়ির নাম মারুতি হলেও সেটা তো সুজুকিরই ভাই।

লন্ডনের International Institute for Strategic Studies প্রকাশিত Military Balance 2014 নামের বিশ্বমান্য বইয়ে বলা হয়েছে জাপানের প্রতিরক্ষা শক্তি অস্ত্রসম্ভারের নিরিখে এশিয়ার মধ্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন। জাপানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসম্ভার নির্মাণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নয় সামরিক শক্তির ঘন ঘন আধুনিকীকরণ করাও। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গড়ে এখানে এসে অস্ত্র নির্মাণ ভারতের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধেজনক ও লাভদায়ী প্রকল্প হওয়ার উপযুক্ত।

যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্র :

পাশ্চাত্যের যে কোনো বিমান নির্মাণ ও ক্ষেপণাস্ত্রের সঙ্গে জাপানের অত্যাধুনিক কলাকৌশল সমান তালে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা ধরে। সে কথা মাথায় রাখলে ভারতের সঙ্গে জাপানের যৌথ অস্ত্র উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রসঙ্গে যুদ্ধবিমান নির্মাণ হবে সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিহীন প্রকল্প। বাস্তবে জাপানি প্রযুক্তি উড়ানের সর্বক্ষেত্রে নজরে পড়বে। Fuji-TS প্রাথমিক প্রশিক্ষণের বিমান থেকে শুরু করে মিতশুবিসির হেভি ইন্ডাস্ট্রির ATD-X Shimshim সবই রয়েছে।

জাপান বারবার প্রমাণ করেছে অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকা বা পাশ্চাত্য থেকে প্রযুক্তি আমদানি করে তা নিজের দেশে প্রয়োগ করার সময় তারা প্রযুক্তিদাতাকেও নৈপুণ্যের মাপকাঠিতে ছাপিয়ে গেছে। নিজের মতো ঘষে মেজে নেওয়া বা নিজের প্রয়োজনানুগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে জাপানিদের জুড়ি নেই।

উদাহরণ আরও ভুরি ভুরি রয়েছে, সেগুলিই নিতান্তই বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার, তাই জাপানের পক্ষ থেকে সত্যিই যদি ভারতের সঙ্গে তুল্যমূল্য কৌশলগত সমঝোতা হয় সেক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে নীতিগত ভাবেই হাত মেলানো উচিত। এই দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ দেশের সমর উৎপাদনকে নতুন প্রযুক্তিগত উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে।

জাপানের বাধ্যবাধকতা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে মারণাস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে জাপানের ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে। জাপান সেই কারণে মারণাস্ত্র ছাড়া অন্য প্রযুক্তি, ভোগ্য বস্তু, নানান সর্বাধুনিক প্রযুক্তির গাড়ি রপ্তানিতে পাশ্চাত্যের একচেটিয়া বাজার অনেকদিনই কেড়ে নিয়েছে। আমেরিকায় অনেক গাড়ি কোম্পানি প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারেনি। আন্তর্জাতিক পরিবহণ ব্যবস্থায় আজ জাপানের নির্ণায়ক ভূমিকা। ভারত সেই ১৯৯১ থেকে তার গাড়ি, বাইক শিল্পের বাজার অবলীলায় জাপানিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া প্রত্যক্ষ করেছে। ভারতে চলা জাপানি প্রযুক্তির যানবাহন অত্যন্ত সফল ও জনপ্রিয়। এগুলির উৎপাদনও যৌথ উদ্যোগে ভারতব্যাপী হচ্ছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন জাপানি যৌথ উদ্যোগে ভারত ও জাপান উভয়েই Win-Win অবস্থায়। তাই কালবিলম্ব সমর্থনীয় নয়।

(লেখক সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট এবং একজন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক-বিশেষজ্ঞ)
(সৌজন্যে : টেলিগ্রাফ)

গ্রাম, বর্ষা, বাজ-পড়া, সাপে-কাটা ও সরকার

প্রবীর ঘোষ

সাপ, বর্ষা, গ্রাম, মাঠঘাট, সরকার, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি একটার সঙ্গে একটা কেমনভাবে যেন জড়িয়ে আছে। ঋতু কাল আজকের দিনে পুরনো নিয়ম মেনে প্রায় উঠে গেলেও বাঙালির কাছে বর্ষাই জাতীয় ঋতু এবং বর্ষার ভালোমন্দ, সুবিধা- অসুবিধার সঙ্গে অবশ্যই সাপ জড়িত, বিশেষভাবে গ্রামে-গঞ্জে। আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুমাস বর্ষাকাল। আমাদের জানা থাকলেও, ঠিকঠাকভাবে প্রকৃতি তা মেনে চলে না এবং আমরা অধিকাংশ মানুষ আষাঢ়-শ্রাবণ কবে পড়লো ও 'আজ বাংলার কতো তারিখ' তা জানি না ও বলতে পারি না। বর্ষায় চাষাবাদের কাজ এবং কৃষকের দ্বারা আমাদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি অতি বৃষ্টিতে বন্যা, নদীর বাঁধ ভাঙা,পাকা ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়া, মাটির ঘরদোর পড়ে যাওয়া— ভেঙে যাওয়া, নানারকম অসুখবিসুখ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার সর্পদংশন অর্থাৎ সাপে কামড়ানো।

বর্ষায় বাজ পড়বে, সাপে কামড়াবে— এ অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। যদিও এই দুটি বিপদ থেকে রক্ষার্থে সরকার কিছুটা সুরাহার ব্যবস্থা করেছে— যা গ্রামগঞ্জের মানুষ, এমনকী শহরের বহু মানুষ জানেন না। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল, সাপের কামড়ে বা বাজ পড়ে মৃত্যু হলে, মৃতের পরিবারকে সত্তর হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে (টাকার পরিমাণ বেড়ে থাকতেও পারে); তবে মৃত্যুর পক্ষে কিছু 'সঠিক তথ্যাদি' অবশ্যই পেশ করতে হবে। 'সঠিক তথ্যাদি'র মানে : (১) বাজ পড়ে বা সাপের কামড়ের মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে থানায় জানাতে হবে। (২) পুলিশকে দিয়ে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের

ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) পঞ্চায়েত অথবা পৌরসভার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের আবেদন জানাতে হবে। ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার কথা জেলাশাসকের অফিস থেকে।

সাপের কামড়ে মৃত্যুর সঙ্গে ওঝা বা গুনিনের সম্পর্ক, বিশেষ করে গ্রামে একেবারে হাঁড়ি ও সরার সম্পর্কের মতো। সাপে কাটা মৃত্যুর জন্য বহু ক্ষেত্রে দায়ী ওঝা বা গুনিনরা এবং অবশ্যই বাড়ির লোকেরা। কেননা ওঝারা বাঁচিয়ে দেবেন এবং হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই— জানানো শুধু নয়, বহু ওঝা সাপে কামড়েছে ঘটনাটা বাড়ির লোকদের গোপন রাখতে বলেন— যাতে তাঁর দু-পয়সা বেশি হয়। এইসব ওঝারা এবং বাড়ির লোকরাও হয়তো জানেন না, রোগীকে তাবিজ-কবজ ও ঝাড়ফুঁক করে মেরে ফেলার জন্য ওঝার গ্রেপ্তার ও জেল হোতে পারে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৬০৪ ধারায়, যা জামিন অযোগ্য অপরাধ। আবার উল্টে ওঝাদের পুরস্কার স্বরূপ দশ হাজার টাকা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে যদি তারা কামড়ের স্থান সাবান-জলে পরিষ্কার করে ধুইয়ে, অজ্ঞান না হয় সেভাবে সাহস জুগিয়ে, বাঁধন (দরকার?) ইত্যাদি দিয়ে যথাশীঘ্র কাছের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বাঁচানোর ব্যবস্থা করেন, তবে। সেখানে ডাক্তার তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতি অনুযায়ী এভিএস ইত্যাদি প্রয়োগের যেন সুযোগ পান।

আমাদের রাজ্যে যেসব সাপের সচরাচর চলাচল, দেখা মেলে, তার মধ্যে মাত্র ৬-৭ রকমের সাপের বেশ বিষ আছে। এরা হলো— গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া, শাখামুটি, শঙ্খচূড় এবং কালাচ সাপ— যার আর এক নাম শিয়রচাঁদা। এরা সাগরদ্বীপ অঞ্চলে যথেষ্ট এবং এরা রাত্রে বিছানার মধ্যে গিয়ে কামড়ায়, গাল বা কপালের ঘাম চেটেও নেয়। তিন শ্রেণীর সাপ ফণা ধরতে পারে— কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড় (এ রাজ্যে এরা কম)। এরা অত্যন্ত বিষধর।

সাপ কানে একদম শুনতে পায় না (হাততালি দিয়ে সাপ তাড়ানো তাই ভুল, বাঁশির আওয়াজও সাপের কানে যায় না), চোখে আবছা (কম) দেখে, আন্দাজে ছোবল মারে। তবুও সাপকে আমরা অধিকাংশ মানুষ ভীষণ ভয় পাই, তা সেই সাপের বিষ থাকুক বা নাই থাকুক। বিশিষ্ট কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'সাপ' নিয়ে ছোট্ট কবিতাটি (ঋণস্বীকার : 'বিরল বর্ণালী' গ্রন্থ সংকলন) এখানে ভীষণভাবে মনে পড়ছে :

সাপ যে— কেউটে হোক-না
হোক— সে সাপ
তাকে যেন অবহেলা করিস্ নে
বাপ্!
তবে এও বলি তোকে
ভয় পেলে যাবি ঠকে—
হোক্ সে কেউটে, তুই মানুষ তো
বটে!
সাপ যে— কেউটে
হোক-না-হোক— সে সাপ
বাছারে, তবু বলি ভয় পাওয়া
আরও বড় পাপ।

ইরাক : ইসলামের ভ্রাতৃত্ববন্ধন সোনার পাথরবাটি

নীতিন রায়

সিরিয়া ও ইরাক আগ্নেয়গিরির লাভার মতো ফুটছে। মানুষ হয়ে উঠেছে ধর্মীয় পিশাচ। রাসায়নিক মারণাস্ত্রের যন্ত্রণায় রাস্তাঘাট দিয়ে নগ্ন নর-নারীরা যন্ত্রণায় ছুটছে। বন্দুকের আওয়াজ, ট্যাঙ্কের ঘরঘরানি ও শিশুর আর্তচিৎকারে ইসলামের শান্তির মিথ মিইয়ে গেছে। শিয়াভ্রাতা ও সুন্নিভ্রাতারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইসলামিক চির-অশান্তির বার্তাবহ হয়ে থাকছে। নির্বাচনের সময় দিল্লীর এক ইসলামিক পণ্ডিত বলেছেন, ইসলাম একটি রাজনৈতিক ধর্ম। পাকিস্তানের হাফিজ সঈদ বলেন, কোরানের প্রধান বিষয় জেহাদ। তাই জেহাদে অস্ত্রশস্ত্র প্রশিক্ষণে কোনো অন্যায় নেই। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নিজেই বলেছেন, হাজার বছর নামাজ পড়ে যে সওয়াব হয় তার চেয়ে বেশি সওয়াব জেহাদে এক বিন্দু রক্ত ঝরিয়ে অর্জন করা যায়।

সিরিয়ার সমস্যাই ইরাকে বিস্তৃত হয়েছে। সিরিয়ার আসাদ সরকারের প্রতি সে দেশের মাত্র ১২ শতাংশ মানুষের সমর্থন রয়েছে এবং তারা শিয়া। সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিরা গরিব ও অশিক্ষিত। সুন্নিদের অভিযোগ তারা শোষিত। আসাদ হিটলারি কায়দায় শাসন চালাতেন। সিরিয়া সরকারকে সাহায্য করছে— (১) সরকারি সেনা, (২) রাশিয়া ও (৩) ইরান। সুন্নি বিদ্রোহীদের মদতকারী (১) কাতার, (২) সৌদি আরব, (৩) আমেরিকা ও তুর্কী। ২০১৩ সালে হিজবুল্লা এই সঙ্কটে প্রবেশ করে এবং শিয়াদের সমর্থন করে। সিরিয়ান সেনাবাহিনীর সুন্নিরা সেনাবাহিনী ছেড়ে 'ফ্রি আর্মি' গড়ে তোলে। সরকারি সেনা ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সংঘর্ষে গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটে। জাতিসঙ্ঘের মতে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। এই সংঘর্ষে রাসায়নিক মারাণাস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

ইরাকের বর্তমান ঘটনা ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ে যে প্রশ্ন ছিল তা উস্কে দিয়েছে। ইরাকের এই গৃহযুদ্ধের পিছনে রয়েছে ইসলামিক মতবাদ। গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে এক অপরের শত্রু হয়ে উঠেছে একই দেশবাসী। এই মতবাদের জন্য কিছু আমেরিকান যুবকও আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধেই লড়াই করেছে। শিয়া, সুন্নি ও কোর্দরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে। জাতপাতের ভিত্তিতে ইসলাম আজ এক রাজনৈতিক মতার্দশে পরিণত হয়েছে এবং তার সঙ্গে রাখা রয়েছে ভোগবাদ।

কার কি ভূমিকা : ইরান-ইরাক পরস্পর শত্রু দেশ। এই লড়াই তাদের এক জায়গায়

আন্তর্জাতিক

এনেছে। সুন্নিরা ইরানের রক্ষীদের উপর আক্রমণ চালায়। শিয়া অধ্যুষিত ইরান অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে শিয়াদের সাহায্য করছে।

সৌদি আরব : সুন্নি অধ্যুষিত দেশ। সেইজন্য আই এস আই এস-কে অর্থ ও সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছে সৌদি আরব।

কাতার : সৌদি আরবের পথে হাঁটছে।

সিরিয়া : শিয়া সরকার অর্থাৎ ইরাক সরকারকে বিমান ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে।

এই সংঘর্ষে রাশিয়া সিরিয়া ও ইরাক সরকারকে এবং আমেরিকা সিরিয়ার বিদ্রোহীদের মদত দিচ্ছে। গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স তাই। কিন্তু আমেরিকা এখন ইরাকে আই এস আই এস-এর রূপ দেখে ইরাকের শিয়া সরকারকে সমর্থন করছে।

কুশীলব : সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদ শিয়া সম্প্রদায়ের। তাঁর আদেশে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সিরিয়ান সেনারা। নাউরি আল মানিকি ইরাকের প্রধানমন্ত্রী। তিনি শিয়া, সুন্নিদের জায়গা দিতে নারাজ।

আবুবকর আল বাগদাদি একজন নিষ্ঠুর জেহাদি ও সন্ত্রাসবাদী। আলকায়দার আলজাহিরির পরেই তাঁর স্থান। নিষ্ঠুরতায় সবচেয়ে এগিয়ে। ২০০৬ সালে আমেরিকার হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু ২০০৯ সালে মুক্ত হয়ে যান। তিনি নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেছেন। খলিফার রাজত্ব কায়েম করে ইরাক, সিরিয়া মিশর, লেবানন ও ইজরাইলকে একত্রিত করতে চান। সুন্নিদের প্রাধান্যে শাসন চালাতে ইচ্ছুক। হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে আলজাহিরি আবেদন জানালে তিনি বলেন, "জাহিরির পথে নয়, আল্লার পথে চলতে চান।"

ইজ্জত ইব্রাহিম আল দাউড়ি : সাদ্দাম হোসেনের সেনানায়ক। সবাই অনুমান করেছিলেন তিনি মারা গেছেন। সুন্নিদের মসুল অধিকারে তাঁর বড় ভূমিকা রয়েছে।

সিরিয়ার সুন্নি সন্ত্রাসবাদী দল প্রথমে গড়ে 'ইসলামিক স্টেট ফর ইরাক'। পরে আই এস আই এস রূপে পরিচিত হয়। অনেক জায়গায় আই এস আই এল রূপে পরিচিত। আই এস আই এস হলো 'ইসলামি স্টেট ফর ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া'। কোনো ক্ষেত্রে সিরিয়ার বদলে লেভেন্ট যোগ করা হয়। এর অর্থ আসে সৌদি আরব থেকে। অনেকে বলে আই এস আই এস হচ্ছে সৌদি প্রজেক্ট। কাতার জর্ডন তুর্কিরা অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। তেলের খনি থেকে আয় করে আই এস আই এস। আয়ের আরেকটি উৎস হচ্ছে লুটতরাজ। জেহাদে লুটতরাজ বৈধ, যাকে বলা হয় গনিমতের মাল। তাদের এই সম্পদের পরিমাণ ২.৫ বিলিয়ন ডলার। সদস্য সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার। সিরিয়া ও ইরাকের দলত্যাগী সেনারা যোগ দিয়েছে আই এস আই এস-এ। জেলের অপরাধীরাও সাথী হয়েছে।

ইসলামের প্রারম্ভেই এই লড়াই বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে খলিফারা এ লড়াই অমুসলমানদের বিরুদ্ধে চালনা করেন। এখন অমুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার ক্ষমতা নেই, তাই নিজেরা লড়াই করছে। ইসলাম কি ইতিহাস হতে চলেছে? কারণ রোজার মাসেও ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ নেই। ধর্মের নামে এদের প্রধান রাজনৈতিক চরিত্র অমুসলমানদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

অশোক স্তম্ভের উৎপত্তি

সৌমেন নিয়োগী

সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবার আগে সম্ভাব্য কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন সে ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত নই। তথাপি এটা অত্যন্ত সঠিক যে অশোক স্তম্ভগুলি নির্মাণের পেছনে বৌদ্ধধর্মের পূর্বে প্রচলিত ধর্মীয় মতগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বৌদ্ধধর্ম যেহেতু পূর্ব প্রচলিত গয়া ও পূর্বভারতের 'ব্রহ্ম-ধর্ম' পদ্ধতি থেকেই উদ্ভূত, সুতরাং অশোকের স্তম্ভ নির্মাণের পেছনে পূর্বতন 'ব্রহ্ম-ধর্ম' পদ্ধতির প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। বুদ্ধ সমসাময়িক যুগে ভারতে প্রচলিত ভারতীয় ধর্মীয় পদ্ধতির চিহ্ন ও সৌধগুলি বৌদ্ধধর্মে আত্মীকরণ হয়েছে। যেমন কিছু পণ্ডিতদের মতে বৌদ্ধ চৈত্য ও স্তূপগুলি বৌদ্ধ পূর্ববর্তী ধর্মের প্রচলিত ধর্মীয় পদ্ধতির অবয়ব। যদিও 'ব্রহ্ম-ধর্ম' পদ্ধতির প্রচলিত চিহ্নগুলি বৌদ্ধধর্মে আত্মস্থ হয়েছে। তথাপি অশোক-পূর্ববর্তী যুগের কোনো বিশেষ পুরাতাত্ত্বিক নমুনা পাওয়া যায়নি, সম্ভবত ভঙ্গুর পদার্থের জন্যেই। আমরা জানি সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর এবং তার প্রচারের জন্য বিভিন্ন শিলালিপিতেই যে কথাটি বেশিরভাগ ব্যবহার করেছেন সেটি হলো 'ধম্ম'। এবং সেইটি সুনিশ্চিতকরণের জন্য 'ধম্ম-স্তম্ভের' আবির্ভাব হয়েছে তার প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভগুলির দ্বারা। এইরূপ নির্মাণের পেছনে হয়ত অশোক 'দেব-ধর্ম' সম্প্রদায় হওয়ার জন্যেই, যা বুদ্ধ সমযুগীয়। অশোক যদিও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, কিন্তু অব্রাহ্মণ্য 'ব্রহ্ম-ধর্ম' যা সে যুগে মগধে প্রচলিত ছিল তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন এবং এটা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর তার গৃহীত 'দেবনাম প্রিয়' নামই অনুরূপ ইঙ্গিত বহন করে।

অশোকস্তম্ভগুলিকে পণ্ডিতেরা বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করেছেন। স্তম্ভের উপরের কারুকার্য বিশিষ্ট জীবকে স্বয়ং বুদ্ধ স্বরূপ এবং শিলাবেদী বা এবাকাসে (Abacus) খোদিত ধর্মচক্রের মধ্যে অশ্ব, হস্তি, ষাঁড়, সিংহ বিভিন্ন হিন্দু দেবতার চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে স্বয়ং বুদ্ধের অধীনতা স্বরূপ। যেমন— সিংহ দুর্গার প্রতীক, অশ্ব সূর্য দেবতার প্রতীক, ষাঁড় বা বৃষ শিবের প্রতীক, হস্তি ইন্দ্রের প্রতীক। এবাকাসে ধর্মচক্র বৌদ্ধধর্ম চক্র নয়। কারণ এটি পূর্বেই বৌদ্ধদের চিহ্ন হিসেবে স্বীকৃত। পণ্ডিত স্টেলা ক্রামরিস (Stella Kramrisch)-এর মতে সিংহের অধিষ্ঠান পূর্বে ছিল, উত্তর-বেদী স্থানে যা কিনা পরম জীবনী-শক্তির স্থান এবং বাক্ যিনি ব্রহ্মার স্ত্রী রূপে খ্যাত। বাজ্ সংহিতা (খণ্ড-১২) অনুসারে ব্রহ্মার স্ত্রী সিংহী যার বাহন স্বরূপ। 'বিষ্ণুর ধর্মত্বরম্' (খণ্ড-৩, অধ্যায়-৬৭) অনুসারে সূর্যের পতাকায় সিংহ ধর্মরূপেই বর্ণিত।

ঐতেরেয় উপনিষদ অনুসারে (খণ্ড-৩, ১.৩) সমস্ত জীবই ব্রহ্মস্বরূপ :

'অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ যৎকিঞ্চ ইদং প্রাণী জঙ্গমং চ পত্রাত্রি চ।

যচ্চ স্থাবরং,— সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রাং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং, প্রজ্ঞানেত্রা লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।'

—"ঘোড়া, মানুষ, হাতি, গোরু— যত প্রাণী এমনকী স্থাবর জঙ্গমের মধ্যেও ইনি হলেন সেই প্রাণ। প্রজ্ঞার সত্তা দিয়েই বিশ্বচরাচর সত্তাবান। প্রজ্ঞাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। এই প্রজ্ঞাই হলো সবকিছুর মূল। জীবজগৎ, জড়জগৎ, লোকালোক— সবকিছু আশ্রয় করে আছে এই প্রজ্ঞানকেই। বিরাট এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। তিনি সেই আত্মা (Consiousness) যিনি আমাদের উপাস্য। তিনি এক অখণ্ড সত্তা, অদ্বিতীয়।"

সুতরাং অশোক স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত হস্তি, বৃষ, সিংহ ও অশ্ব ব্রহ্মকে চিহ্নিত করে। অশোক স্তম্ভের বেদীতে চিহ্নিত মূর্তিগুলি এর দ্বারা প্রমাণ করে যে বুদ্ধ স্বয়ং 'ব্রহ্ম-ধর্ম', সূর্যদেবতা এবং বৈদিক ইন্দ্র ধর্মীয় পদ্ধতিগুলিকে গোপন করতে চেয়েছিলেন। আমরা দেখি সারনাথের এবাকাসের ধর্মচক্রে ২৪ খানা দণ্ড যা 'সাংখ্যের' ২৪ তত্ত্ব অথবা প্রাচীন ক্রূড় প্রকৃতির উপাসনা পদ্ধতির ২৪টি দেবতার সমান যা সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত। (3+5+7+9=24 অর্থাৎ ত্রিরত্র, পঞ্চরত্র ও নবরত্র ধর্মীয় পদ্ধতির মোট সমষ্টি) বৈদিক 'স্কম্ভ-ব্রহ্ম' প্রার্থনায় প্রজাপতি এবং ব্রহ্মকে আহবানের উদ্দেশ্যে স্কম্ভকেই চিহ্নিত করা হয়েছে যাকে অশোক স্তম্ভের মূল ও প্রকৃতির অনুধাবনের জন্য নমুনারূপে নেওয়া যেতে পারে। বৈদিক এই শ্লোকে ব্রহ্মার যে বর্ণনা আছে তা স্তম্ভোকে (স্কম্ভ বা স্থূনা) প্রার্থনা কেন্দ্রস্থ মূল চিহ্ন এবং ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

"He who knows him who is supreme and he who knows the 'Lord of life', there know the loftiest divine" (A.V.X.7.17) সুতরাং এই স্তম্ভকেই বলা হয়েছে প্রাণের ইস্ট (Lord of life 'Skamba is all these world of life' (A.V.X.8.2)

'কম্ভ-ব্রহ্ম' প্রার্থনার শ্লোকে এবং উপনিষদ থেকে আমরা জানতে পারি (স্কম্ভ বা স্থূনা) পরম পুরুষের বা ব্রহ্মের আবাসস্থল। জীবনী শক্তির আকর কেন্দ্র। এই স্তম্ভের উপরিভাগ পুরুষ ও মধ্যভাগ জীবাত্মা। অশোক স্তম্ভের বৃত্তীয় এবাকাস জৈবিক জগতের বিভিন্ন দেবতার অবস্থানকেই ইঙ্গিত করে। 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদ অনুসারে পুরুষ স্বয়ং সিংহ এবং স্কম্ভমুখে পুরুষ অদৃশ্য অথবা অর্ধহিসেবে উপস্থিত। তাই স্তম্ভে বর্ণিত জীবগুলির সকল অংশ পুরোপুরি দৃশ্য নয়। অর্থাৎ কূটস্থপুরুষম্। মহাভারত অনুসারে পুরুষ বিশ্বদিকসম্, সুতরাং অশোক স্তম্ভের চারটি প্রাণী চতুর্দিক ইঙ্গিত করে। ব্রহ্মা চতুর্মুখী সেইরূপ স্তম্ভের ও বর্ণনায় চারটি জীব।

অশোক স্তম্ভ 'ব্রহ্মস্কম্ভের' এর-ই প্রতিরূপ। যেখানে স্তম্ভটি সামান্য অংশে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত। অশোক স্তম্ভ গোলাকার। অবৈদিক 'ব্রহ্ম-ধর্ম' পদ্ধতি যা মগধে প্রচলিত সেই অনুসারে স্তম্ভগুলি অষ্টকৌণিক বিশিষ্ট (Octagonal)। অশোক পিলার অশোকের স্তম্ভগুলি কোনো ভূমিহীন পৃথিবী থেকেই সোজা হয়ে প্রোথিত, যেমনটি ব্রহ্মা স্বয়ং পৃথিবী থেকে উন্মোচিত। সুতরাং মগধের ব্রহ্মধর্মীয় পদ্ধতি অশোকীয় স্তম্ভ নির্মাণের প্রেরক। বৈদিক যুগেও স্তম্ভের পুজো লক্ষ্য করা যায়। এবং সম্ভবত তা বুদ্ধের সময় প্রচলিত যা অশোক অধিগ্রহণ করেছিলেন। পুরাতত্ত্ব প্রমাণ স্বরূপ হিসেবে মথুরার এক ভাস্কর্য যা Lucknow Museum-এ রয়েছে স্তম্ভকে পূজা অর্চনার পদ্ধতিরূপে।

অশোক স্তম্ভ এবং পরবর্তীয় ভারতীয় স্তম্ভগুলির বিশিষ্টতা একটি ক্রমবর্ধমান ধারাবাহিক ঐতিহ্য বহন করে। যখন আমরা ব্যোম্ (Vyom) নামক দেবতার উল্লেখ 'বিষ্ণুর ধর্মত্বরম্' তৃতীয় খণ্ডে পাই তখন সেখানে পূর্ণভাবে দেবতা-স্বরূপ ব্যোমের বর্ণনা পাই। সর্বনিম্নভাগ হবে বর্গাকার তারপর বৃত্তাকার এবং সামান্য চতুষ্কোণিক মেরুর ন্যায় ধার ও শান্ত। ব্যোমের এই তৃতীয়াংশকে 'ভদ্রপীঠ' বলা হয় এবং মধ্যবর্তী চতুষ্কোণিক অংশ 'সম্ভাব্' বলা হয়। এর ঠিক উপর ভাগে অষ্টকমল প্রস্ফুটিত 'পদ্ম' যার মধ্যস্থ ফলত্বক সূর্যদেবতার ইঙ্গিতবাহক এবং প্রস্ফুটিত পদ্মের পাপড়িতে অষ্টদিকপালের অধিষ্ঠান। এহেন ভদ্রপীঠ পৃথিবীর উপরে অধিষ্ঠিত। এহেন ব্যোমের প্রতিরূপ একটি প্রস্ফুটিত পদ্মস্বরূপ যার অন্তে ভদ্রপীঠ এবং তার ভূমিতে ও স্তম্ভে সমস্ত দেবতার আসনস্থল। সুতরাং অশোক স্তম্ভের উপর বর্ণিত--- জীবসমূহ সেই দেবতারই ইঙ্গিত বহনকারী যেন এক ব্যোম। এহেন পীঠের ঐতিহ্য যা দেবতার আসন বলে বর্ণিত 'শৈব ঈশান-শিবা-গুরুদেবা' পদ্ধতি গ্রন্থে, যেখানে এটিকে অনন্ত বলা হয়েছে। ধর্ম সেখানে রক্তিম এবং বৃষ তার আকার। জ্ঞান যেখানে শ্যামবর্ণা সিংহ তার রূপ, বৈরাগ্য পীতবর্ণ ভূত নির্দেশক এবং শ্বেতহস্তী ঐশ্বর্যের প্রতীক। অশোকের এবাকাসে (Abacus) শৈব কৃতির ভূত ছাড়া সমস্ত জীবই বর্তমান। ব্যোমের স্তম্ভদণ্ডটির আকৃতির প্রথমে বর্গাকার; বৃত্তাকার এবং বর্গাকারে তৎস্বরূপ, হিন্দু মন্দিরের স্তম্ভ নির্মাণের উৎপত্তির সঙ্গে যার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এর দ্বারা অশোক কর্তৃক বৌদ্ধ শিল্পকলার অন্যতম সৌধ ও তার স্তম্ভগুলি পূর্ব প্রচলিত ঘোড়া ও মিশ্র প্রকৃতি 'ব্রহ্ম ধর্ম' এবং শৈব ধর্মগত উপাস্য পদ্ধতির সৌধগুলির দ্বারা প্রভাবিত এবং অনুকৃত। 'বৃহৎসংহিতা' অনুসারে বৌদ্ধ মূর্তির ভারতীয় ভাস্কর্যে ব্রহ্মা ও শৈবমূর্তি থেকেই উদ্ভব। বৌদ্ধ (Iconographic) গ্রন্থে 'দশ-ও-তালের' যে পরিমাপ ব্যবহার হয়েছে তা ব্রহ্ম এবং চাকচিক্য মূর্তির জন্যেই। ঋকবেদে ধর্ম ও পূজাপদ্ধতির বিষয়ে বিবাদের বশবর্তী হয়ে আমরা দেবতা ও অসুরের পৃথকীকরণ দেখি। যেখান থেকে বিশিষ্ট গোষ্ঠী বা জাতির বিবাদের ফলে উৎপন্ন বিশেষ সম্প্রদায়কে বোঝায় না। সুতরাং অশোকের স্তম্ভগুলি নির্মাণের পেছনে প্রাচীন ব্রহ্ম ধর্মের (The Cult of Brahma) প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তথ্যসূত্র :

১. The Cult of Brahma Ch-V Brahma Cult and Buddhist Art. Pg. (216-224) by Dr. Tarapada Bhattacharja. ২. উপনিষদ সংগ্রহ। ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ৩. ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ৪. Hindu Temples. Stella Kramrisch.

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

নেত্রদান মহাদান

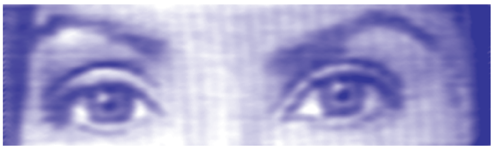

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

মানসিক ভারসাম্যহীনদের আশ্রয়স্থল শ্রীপার্বতী সেবা নিলয়ম্

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রোজকার জীবনে পথ চলতে গিয়ে আমরা বহু মানুষকে দেখি, যারা বাসস্ট্যান্ড থেকে রেলস্টেশন বা অভিজাত পাড়া থেকে রাস্তার অলিগলিতে পড়ে থাকেন। এদের মধ্যে অনেক মানুষই মানসিক ভারসাম্যহীন। স্বামী-সংসার পরিত্যক্তা বা পরিবার থেকে বিতাড়িত এই অসহায় মানুষগুলির বাসস্থান বলতে রাস্তার ফুটপাত। এরা প্রত্যেকেই সমাজের কাছে অচ্ছুত বলে পরিচিত। পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পৃথিবীর মানচিত্রে এদের সঙ্গী বলতে কেউ থাকে না, যার ফলে এই সমস্ত মানুষ বেশকিছু অবাঞ্ছিত কাজকর্ম করে থাকেন। কিন্তু এই ভারসাম্যহীন রোগীও যে সাধারণ জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে সেদিকে কারোরই কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই বললে চলে। মানসিক ভারসাম্যহীনতা একজন ব্যক্তিকে গ্রাস করার ফলে পরিবারের বঞ্চনার শিকার হয়। এমন ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে শ্রীপার্বতী সেবা নিলয়ম্।

শ্রীপার্বতী সেবা নিলয়ম্ গত ১৪ বছর ধরে রাস্তায় পড়ে থাকা এই সমস্ত রোগীর চিকিৎসা করে চলেছে। নিজ উদ্যোগে তাদের জন্য বাসস্থান গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে তাদের নিয়মিত চিকিৎসা চলে। ২০০০ সালে কেরলের ত্রিচুর জেলায় চোলিসেরি গ্রামে প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। এরপর ধীরে ধীরে চলতে থাকে রোগীদের সেবাশুশ্রূষার কাজ। পার্বতী সেবা নিলয়মের লক্ষ্য একটাই— সুস্থ সবল স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনে তাদের স্বরোজগেরে করে তোলা। সম্মানের সঙ্গে সমাজের আর পাঁচজন মানুষের মতো তারাও যেন জীবন অতিবাহিত করতে পারে সেই লক্ষ্যেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীপার্বতী সেবা নিলয়ম্।

সমাজ যখন এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন এদের দিকে সবরকমভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দক্ষিণ ভারতের এই সংস্থা। একটি সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে এদের চিকিৎসা চলতে থাকে। সেই সঙ্গে ভারসাম্যহীন রোগীদের নিজস্ব আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মানের সঙ্গে সেখানে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়া হয়। সংস্থাটি মাতৃসুলভ নির্মল পরিবেশের মধ্যে সেবাকর্মে ব্রতী। ফলে খুব সহজেই তাদের মানসিক ভারসাম্যহীন জীবন থেকে বের করে আনা সম্ভব হয় এবং মনে শান্তির অনুভূতি ফিরিয়ে আনা হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে সময়মতো চিকিৎসা এবং তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখার মতো বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। রোগীদের প্রতিদিন যোগ, ফিজিওথেরাপি ও মেডিটেশনের ক্লাস করানো হয়। ফলে খুব সহজেই তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে থাকে। এছাড়াও তাদের স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়া হয় যাতে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে থাকে। চিকিৎসাকর্মী হিসাবে বিভিন্ন সমাজসেবী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকা অর্থাৎ যাঁরা যে বিষয়ে পারদর্শী তাঁদেরকেই রাখা হয় এই সমস্ত রোগীর জন্য। যাতে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং চিকিৎসা পরিষেবা ঠিকঠাক ভাবে চলতে থাকে। এছাড়াও কিছু সহযোগী আছেন যাঁরা ঔষধের ব্যবস্থা করেন, সময়সূচি অনুযায়ী চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসার সুযোগও রয়েছে এই সংস্থায়। বর্তমানে এই সমস্ত রোগীর জন্যে খরচ বা সংস্থা চালাতে যে ব্যয় হয় তা পুরোটাই শ্রীপার্বতী সেবা নিলয়ম্ সংস্থার সদস্যরা নিজেরাই করে থাকেন। মানসিক ভারসাম্যহীন রোগীদের দেখভালের পাশাপাশি এই সংস্থার পক্ষেই সরস্বতী সেবা যজ্ঞম্ নামে এক প্রকল্প রয়েছে যেখানে স্বল্প আয়ের পরিবারের শিশুদের পড়াশোনার জন্য বই, খাতা, কলম, ব্যাগ দেওয়া হয়। কিছু ছাত্রকে স্কলারশিপও দেওয়া হয় যা দিয়ে তাদের সারা বছরের পড়াশোনার খরচ চালানো যায়। অর্থাৎ স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা সমস্ত দিক থেকেই সজাগ এবং সক্রিয় শ্রীপার্বতী সেবা নিলয়ম্।

মানসিক ভারসাম্যহীনদের স্বরোজগেরে করে তোলার চেষ্টা।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার, গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

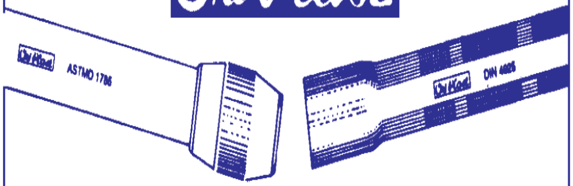

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"আমাদের ধর্ম এমন এক জনগণের ধর্ম যা কখনও বর্বরোচিত অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না এবং যার সঙ্গে শিক্ষার কোন প্রকার দ্বন্দ্ব নেই।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সুস্থ জীবনের একটি স্তম্ভ— আহার

ডাঃ অশ্বিনী কুমার ভার্গব

পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মতোই মানুষও নিজের শরীরের মাধ্যমেই সবকিছু প্রাপ্ত করে থাকে। সমস্ত কামনা-বাসনার পূর্তিও শরীরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আবার দেবগণ, পিতৃঋণ ও মাতৃঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি শরীরের মাধ্যমেই। এ জন্য খুবই যত্নপূর্বক আমরা শরীরকে রক্ষা করে থাকি। এই শরীরের রক্ষার জন্য শাস্ত্রে দিনচর্যা, ঋতুচর্যা, আশ্রম ব্যবস্থা ও সন্তুলিত আহার-বিহারের বর্ণনা আছে। আমাদের মহাপুরুষরা জীবন ও প্রকৃতির সমস্ত দিকই পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে প্রাণীমাত্রেরই মঙ্গলের জন্য এক আদর্শে জীবনপদ্ধতি বিকশিত করেছেন। তাঁরা এমন কিছু জীবনসূত্রের সন্ধান দিয়েছেন যা পালন করে মানুষ শারীরিক ও মানসিকরূপে ভাবে সুস্থ থেকে সুখে বেঁচে থাকে। উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিই সুখ লাভ করতে পারেন। আমাদের মনীষীরা সুস্থ জীবনের তিনটি স্তম্ভের উল্লেখ করেছেন— 'আহারঃ স্বপ্নো ব্রহ্মচর্যমিতি'—চরক সূত্র ১১/৩৫।

চরকসূত্র অনুসারে সুস্থ জীবনের প্রথম স্তম্ভ হলো আহার। শরীরের জন্য আহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আহারের দ্বারা শরীরের পুষ্টিবর্ধন হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে সমস্ত ঐশ্বর্য ছেড়ে সর্বপ্রথম শুদ্ধ, সাত্ত্বিক ও পৌষ্টিক আহারের সংস্থান করা প্রয়োজন। কেননা আহারের ফলেই মানুষের রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জা তৈরি হয়। সেজন্য শরীরের জন্য হিতকর আহারকে পথ্য এবং অহিতকর আহারকে অপথ্য বা কুপথ্য বলা হয়।

সুশ্রুত সংহিতা অনুসারে, আহার তৃপ্তিকারক, তাৎক্ষণিক শক্তি প্রদানকারী, তেজ, বল ও স্মরণশক্তি বর্ধক এবং শরীর পুষ্টকারক হবে। শুধুমাত্র খাওয়ার জন্যই খাওয়া নয়, সুস্থ, বলিষ্ঠ, পুষ্ট ও দীর্ঘজীবী হতে গেলে আমাদের খাদ্যকে প্রাকৃতিক, পৌষ্টিক, ভিটামিনযুক্ত, বলকারক, তাজা ও সুপাচ্য হতে হবে।

সমস্ত রোগই অপথ্য বা কুপথ্য

গ্রহণেই হয়। সেজন্য সংযমপূর্ণ ও শুদ্ধসাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করে দীর্ঘজীবনের আনন্দ অবশ্যই লাভ করা যায়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে চিকিৎসার প্রথম সূত্রই হলো ঠিকমতো পথ্য গ্রহণ এবং অপথ্য পরিহার করা।

আহার বিষয়ে প্রথম কথা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক করতে হবে যে, তার পক্ষে উপযুক্ত আহার কেমন হবে। কেননা আহারের ওপরেই ব্যক্তির প্রকৃতি নির্ভর করে। পুষ্টিবর্ধক আহার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আহার সম্পর্কিত কতকগুলি কথা আমাদের মেনে চলা উচিত :

- ভোজনের আধঘণ্টা আগে জলপান করতে হবে।
- প্রয়োজনের থেকে কিছু কম খাদ্যগ্রহণ করতে হবে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে— পাকস্থলির অর্ধভাগ খাদ্য দিয়ে, এক চতুর্থাংশ তরল দিয়ে এবং এক চতুর্থাংশ খালি রাখতে হবে। কেননা বায়ু ছাড়া খাদ্যদ্রব্য ঠিকভাবে হজম হতে পারে না।
- খাবার সুপাচ্য ও রুচিকর হতে হবে।
- এক প্রকারই খাদ্যদ্রব্য অধিকমাত্রায় গ্রহণ না করা।
- খাবারে সমস্ত রস অর্থাৎ মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় থাকা চাই।

আচার্য চরক খাদ্য গ্রহণের দশ প্রকার নিয়মের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

(১) খাদ্যদ্রব্য গরম থাকতেই গ্রহণ করতে হবে। ঠাণ্ডা ও বাসি খাদ্য পরিহার করতে হবে।
(২) স্নিগ্ধ আহার গ্রহণ করতে হবে।
(৩) পরিমাণ মতো।
(৪) বীর্যবিরুদ্ধ আহার না করা।
(৬) পরিষ্কার বাসন ব্যবহার করা।
(৭) তাড়াতাড়ি না খাওয়া।
(৮) দীর্ঘসময় ধরে না খাওয়া।
(৯) খাওয়ার সময় কথা না বলা।
(১০) ভগবৎ চিন্তা করতে করতে খাওয়া।

খাওয়ার সময় হিতকারী ও অহিতকারী সংযোগ অবশ্যই মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ দ্রব্য একই সঙ্গে না খাওয়া।

শরীর থাকলেই রোগ থাকবে। কিন্তু আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়াতে যদি আমরা উচিত পরিবর্তন আনতে পারি তাহলে অনেক রোগের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি। তাই সন্তুলিত খাদ্য গ্রহণে ডাক্তারবাবুরা সুস্থ শরীরের গ্যারান্টি দিতেই পারেন।

(লেখক জলন্ধরের দয়ানন্দ আয়ুর্বেদিক কলেজের রিডার)

সমাবেশ সমাচার

কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

মা সারদা সেবা ভারতী, বাগবাজারের উদ্যোগে উত্তর কলকাতার বাগবাজার হাইস্কুলে গত ২৭ জুলাই বিকাল ৫টায় কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। বাগবাজার বস্তি এলাকার যেসব ছাত্রছাত্রী কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়াশুনা করে পাশ করে তাদেরই এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি অ্যাডভোকেট সঞ্জয় ঘোষ বিদ্যার্থীদের পড়াশুনার ব্যাপারে সমস্ত রকম আইনি সহায়তা বিনা পারিশ্রমিকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সমাজসেবী শশাঙ্ক শেখর দে বিদ্যার্থীদের পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সেবার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সার্কেল ইঞ্জিনিয়ার সাগর রায়, বিশেষ অতিথি প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির গবেষক অধ্যাপক সায়ক গঙ্গোপাধ্যায় ও সেন্ট থমাস ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক বিদ্যুৎ রায়চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সেবা ভারতীর পক্ষ থেকে একটি ফ্রি কোচিং সেন্টার চালানোর কথা ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষিকা অমলা বসাক ও সেবা ভারতীর সভাপতি জয়ন্ত সেন।

বিষহরি ঠাকুরের মেলা উপলক্ষে জলসত্র

গত ১ আগস্ট বলাগড় প্রখণ্ডের অন্তর্গত হুগলী জেলার ঐতিহ্যবাহী মা বিষহরি ঠাকুরের পূজা ও মেলা উপলক্ষে কোলড়া গ্রামে (মেলার যাত্রাপথে) বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচালনায় এক জলসত্রের আয়োজন করা হয়। জলসত্র থেকে অগণিত ভক্তকে জল ও বাতাসা দান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুশীল ভট্টাচার্য, বলাগড় প্রখণ্ডের সভাপতি তপন মুখার্জী, সুদীপ্ত দাস, রঘুনাথ দেবনাথ প্রমুখ। এই কর্মসূচি স্থানীয় এলাকায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সর্বস্তরের জনগণ এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

লঘু উদ্যোগ ভারতীর রাজ্য সম্মেলন

গত ৩১ জুলাই শিলিগুড়ি জেলার ডাবগ্রামে লঘু উদ্যোগ ভারতী ও জেডি আই ও ডব্লিউ এ সংস্থার উদ্যোগে প্রস্তাবিত লঘু ও ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা (নিয়োগ সম্পর্কিত) আইন-২০১৪ বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লঘু উদ্যোগ ভারতীর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও.পি.মিওল। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগের চেয়ারম্যান সব্যসাচী বাগচী। তিনি বিগত এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার করে ভবিষ্যতের জন্য এগিয়ে যাওয়া এবং প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলেন। তিনি ছোট এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে টিকিয়ে রাখার ওপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লঘু উদ্যোগ ভারতীর সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক প্রকাশ চন্দ।

তাঁর কথাতেও উঠে আসে ভারতীয় শিল্পে এই ছোট এবং ক্ষুদ্র শিল্পের কথা। এ রাজ্যের উত্তরবঙ্গের ২১ জন সদস্যকে নিয়ে একটি রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়। বিজয় আগরওয়াল সভাপতি ও রমেশ সিংহল সম্পাদক নির্বাচিত হন।

শোকসংবাদ

দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণী ব্রহ্মপুর নিবাসী সঙ্ঘশুভানুধ্যায়ী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণ কলকাতা জেলার প্রাক্তন সম্পাদক ও স্বস্তিকার সুহৃদ বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় গত ২৭ জুলাই সকালে দীর্ঘ রোগভোগের পর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও ৪ নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। এতদঞ্চলের বহু সেবামূলক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

***

মালদা জেলার গৌড় খণ্ডের পার্বত্যা শাখার স্বয়ংসেবক তথা যদুপুর মণ্ডল কার্যবাহ পবন ঘোষের পিতা নিতাই ঘোষ (৫৫) গত ২২ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বিশেষ প্রতিবেদন

মধ্য ও নিম্নবিত্তদের উচ্ছেদে কলকাতা পুরসভা

দেবাংশু ঘোড়ই

আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল ব্যতীত অন্যান্য যে কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে কলকাতা পুরসভার তৈরি করা তথাকথিত সরল কর 'Assessment System' বা 'Unit Area Assessment' নামক একটি সরল কর

ব্যবস্থার ইস্যু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এই সরল কর ব্যবস্থা ২০১১ সালে লাগু করা হয় কলকাতা পুরসভার মাধ্যমে। কলকাতা পুরসভার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য আধিকারিকেরা দাবি করেছেন যে উক্ত পদ্ধতিতে কর অনেক কমে যাবে এবং করব্যবস্থার সরলীকরণ ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে এই করব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই কর আরোপের প্রভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাড়িওয়ালা/ ভাড়াটিয়া প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ও আর্থিকভাবে বেশ টানাটানির মধ্যেই পড়বেন।

এখন দেখা যাক কি এই 'Self Assessment System' বা 'Unit Area Assessment'। সমগ্র কলকাতা অঞ্চলকে কলকাতা পুরসভা মোট সাতটি অঞ্চল বা জোনে ভাগ করে নিয়েছে। সাতটি জোন 'A' থেকে 'G' এবং প্রতিটি জোনের জন্য আলাদা আলাদা Base Unit মূল্য ধার্য করা হয়েছে প্রত্যেকটি বাড়ির প্রতি বর্গফুট এরিয়া প্রতি। সুতরাং, এতদিন ধরে যে করব্যবস্থা চালু ছিল অচিরেই তা দেখা যাবে যে 'A' থেকে 'E' জোনের জন্য কর কম করেও পর্যায়ক্রমে ১০০ থেকে ২০০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। শুধুমাত্র 'F' ও 'G' জোনের কর কমবে। দেখতে গেলে এই করব্যবস্থাটি অত্যন্ত জটিল এবং বেশ খরচসাপেক্ষও বটে। কারণ প্রত্যেক বাড়ি 'Chartered Valuer' বা 'Registered L.B.S/Licensed Building Surveyor'-কে দিয়ে মাপিয়ে তাদের সার্টিফিকেট দিয়ে তবেই পুরসভায় কর জমা করতে হবে এবং তা পাঁচ বছর অন্তর অন্তর করতে হবে, তাতে যদি কোনো ভুল বের হয় তাহলে বাড়ির মালিকের উপর প্রচুর পরিমাণে সুদ ও জরিমানা আরোপ করা হবে এবং জনগণ যদি ওই কর দিতে না পারেন তা হলে পুরসভা থেকে বের করে দিতে পারবেন এবং ওই বাড়ির যাবতীয় মালপত্র, তৈজসপত্র বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। Kolkata Municipal Corporation Act, 1980-এর Section 182A(1)(c)-তে 'Chartered Valuer' বা 'Registered L.B.S./Licensed Building Surveyor' সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং ওই আইনেরই Section 182A(8)-তে বাড়ির মালিকের উপর প্রচুর পরিমাণে সুদ, কর ও জরিমানা আরোপ করার কথা উল্লেখ করা রয়েছে।

চিরায়ত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাবলী
কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন কৃত
আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ (চারখণ্ডে) ১০০০
সংস্কৃত মূলপাঠ ও টীকাসহ সরল বঙ্গানুবাদে
কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা (চারখণ্ডে) ৮০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
প্রাচীন ভারতের আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়ন চিন্তা ৩০০
মহর্ষি সুশ্রুত বিরচিত
সুশ্রুত সংহিতা (চারখণ্ডে) ৮০০
মহর্ষি শার্ঙ্গধর বিরচিত
শার্ঙ্গধর ঃ চিকিৎসা সংগ্রহ ১৭৫
শ্রীচক্রপাণি দত্ত বিরচিত চক্রদত্ত ২২০
শ্রী রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদ সোপান ১০০
মহামতি শ্রীমৎ মাধবকর বিরচিত নিদান ৩৫০
(রোগবিজ্ঞান, রোগনির্ণয়-সংগ্রহ ও নাড়ীজ্ঞান রহস্য গ্রন্থ তিনটি সংযোজিত)
শ্রীমৎ রাখাল দত্ত কবিরাজ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদীয় ফলিত চিকিৎসাবিধান ২৭৫
মহর্ষি বাগভট অষ্টাঙ্গহৃদয় (দুইখণ্ডে) ৪০০
মহামুনি কণাদ বিরচিত
নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ ৭৫
আচার্য ভাবমিশ্র বিরচিত
ভাবপ্রকাশ (চার খণ্ডে) ১২০০
আচার্য গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বিরচিত
রসেন্দ্রসার সংগ্রহ ২০০
মহর্ষি বাগভট বিরচিত
রসরত্নসমুচ্চয় (দুই খণ্ডে) ৬০০
(রসরহস্য বিজ্ঞানম ও পরিভাষা প্রদীপ গ্রন্থ দুইটি সংযোজিত)
অধ্যক্ষ সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন কৃত
কায়চিকিৎসা ২৫০
ভিষগ্বর গোবিন্দদাস বিশারদ বিরচিত
ভৈষজ্য রত্নাবলী (তিনখণ্ডে) ৭০০
অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক
আয়ুর্ব্বেদ সিদ্ধান্ত ঃ দর্শন ও পদার্থসূত্র ২২৫
আয়ুর্ব্বেদ সংকলন ২২৫
(শারীরবিজ্ঞান, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা, আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস, সহজ রোগনির্ণয়)
সদ্য প্রকাশিত নতুন সংস্করণ
মহর্ষি চরক বিরচিত
চরক সংহিতা (প্রথম খণ্ড) ৩৫০
সূত্রস্থান।। নিদানস্থান।। বিমানস্থান।।
চরক সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড) ৪০০
শারীরস্থান।। ইন্দ্রিয়স্থান।। চিকিৎসিত স্থান।। (প্রথমাংশ)
চরক সংহিতা (তৃতীয় খণ্ড) ৩৫০
চিকিৎসিত স্থান (শেষাংশ)।। সিদ্ধিস্থান।। কল্পস্থান।।
দীপায়ন
২০, কেশব সেন স্ট্রিট, কল-৯
☎ ২২৪১-৪১৫০
E-mail : deepayan07@gmail.com

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পুরসভা কর্তৃপক্ষ ওই বিভিন্ন জোনের জন্য বিভিন্নরকম Base Unit মূল্য চালু করেছেন। যেমন—

জোন	**বরাদ্দ টাকা/বর্গফুট**
A	৮৫/-
B	৬৫/-
C	৫০/-
D	৪০/-
E	৩০/-
F	২০/-
G	১৫/-

কার্যত দেখতে গেলে এই প্রস্তাব অযৌক্তিক এবং সম্ভবত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনগণকে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতা থেকে আইনত উচ্ছেদ করার একটি চক্রান্ত ও প্রক্রিয়ামাত্র। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে পুরসভা কর্তৃপক্ষ নগরবাসীদের জন্য শুধুমাত্র রাস্তা মেরামত, পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জলের ব্যবস্থা করে। ফলে প্রতি বর্গফুটে Base Unit মূল্যানুযায়ী যে কর চাপানোর প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে তা অস্বাভাবিক এবং যা সাধারণ মানুষকে শুধুমাত্র নিষ্পেষণ-ই করবে।

কলকাতা পুরসভার তৈরি করা এই আইন সম্পূর্ণভাবে অসামঞ্জস্য এবং যা কিনা West Bengal Premises Tenancy Act-এর সঙ্গেও সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিহীন। কারণ West Bengal Premises Tenancy Act-এর কোথাও প্রতি বর্গফুট আকারে ভাড়া নেবার কথা বলা নেই। কিন্তু কলকাতা পুরসভার নতুন আইনানুযায়ী তা বলা আছে। বাড়ি থেকে প্রাপ্ত আয়ের থেকে যদি প্রদত্ত কর অধিক হয় তাহলে সেটা কখনই কাম্য নয়। তাছাড়াও বাড়িঘর মেরামতির খাতেও বাড়ির মালিকের বেশ খরচ হয়। এই পদ্ধতি করপ্রদানকারী মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মাথা গোঁজার আশ্রয় কেড়ে নেবে যা কখনই কাঙ্ক্ষিত নয়। কলকাতা শহরে বহু পুরানো বাড়ি আছে কিন্তু তার মালিকেরা সবাই উচ্চবিত্ত বা বড়লোক নয়, শুধুমাত্র বংশ পরম্পরায় ভোগ দখল করে আসছে। কিন্তু পুরসভার নতুন আইনানুযায়ী বা পদ্ধতিতে বড় বাড়ি মানেই বড়লোক ধরে নেওয়া হবে যদিও Kolkata Municipal Corporation Act, 1980-এর Sction 173B অনুযায়ী একটি Review Committee-র কথা বলা হয়েছে। কিন্তু Review Committee-র প্রস্তাব অনুযায়ী কর যে কমবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই যে কমবে তা শুধুমাত্র এক বছরের জন্য বৈধ থাকবে এবং এই আইনে কিছু লোক দেখানো Multiplicative Factor-র কথা বলা হয়েছে। যদি শহরে এই করব্যবস্থা চালু হয় তাহলে শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের আরও দারিদ্রের মুখে ঠেলে দেবে। কারণ এমনিতেই বাজারে সব জিনিসপত্রের ক্রমশ বর্ধিত মূল্যের ফলে সাধারণ মানুষের 'নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর' অবস্থা। উক্ত পদ্ধতিতে বাড়ির মালিকেরা বলির পাঁঠা হবে সবচেয়ে বেশি কারণ প্রাথমিকভাবে কর দেবার দায়িত্ব বাড়ির মালিকের। এক্ষেত্রে যদি তার ভাড়াটে কর না দেয় তাহলে বাড়িওয়ালাকেই তা নিজের পকেট থেকে দিতে হবে এবং তা আদায় করতে গিয়ে আইন আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। ফলস্বরূপ অহেতুক খরচ বাড়বে বই কমবে না। বলাবাহুল্য এই কর পদ্ধতিতে ভাড়াটে যা ভাড়া দেয় তার বহুগুণ কর হবে। কারণ কর নির্ধারিত হবে ভাড়াটে কত বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নিয়ে আছে তার উপর। অথচ কর হওয়া উচিত কে কতটা পরিষেবা পুরসভার কাছ থেকে পেল তার উপর। কার বাড়ি কত বড়, কে কোন অঞ্চলে থাকে তার উপর নয়— যা বিচার্য হয় শুধুমাত্র সম্পত্তি কেনাবেচার সময়। যদিও এই করব্যবস্থার ফলে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, তবে পুরসভার আধিকারিকেরা কিন্তু ভালই থাকবেন। তারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ও গাড়িতে বসে ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। এই করব্যবস্থা চালু হলে কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের অচিরেই আশ্রয় হবে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ফুটপাতগুলিতে। সুতরাং দেখতে গেলে উক্ত করব্যবস্থা অবাস্তব, বৈষম্যমূলক ও নিষ্পেষণের হাতিয়ার। অথচ মা-মাটি-মানুষের সরকার আজ পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল হয়েছেন এদেরেই দেওয়া ভোটে বা হাত ধরে। সুতরাং এমন কোনো করব্যবস্থা হওয়া উচিত নয় যা সাধারণ মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই কেড়ে নেবে। পুরসভার প্রত্যেক 'জনশুনানি'-তে বিভিন্ন বাড়িওয়ালা ও তাদের সংগঠন এমনকী ভাড়াটিয়া সংগঠনের লোকেরাও উক্ত কর পদ্ধতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু কলকাতা পুরসভা ও তার আধিকারিকেরা তা কানে তো তুলছেন-ই না বরং তাদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করতে পিছপাও হচ্ছেন না।

এইরূপ একই কর পদ্ধতি পূর্ববর্তী সরকারও সল্টলেক এলাকায় চালু করতে চেয়েছিল। Saltlake Welfare Association দেশের মহামান্য শীর্ষ আদালতের কাছে আর্জি জানিয়ে মামলা করায় উক্ত করপদ্ধতি বাতিল হয়। সুতরাং কলকাতা পুরসভা যদি এই পদ্ধতিতে কর নেওয়া চালু করে তাহলে সেটারও যে একই অবস্থা হবে তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER
OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

কমনওয়েলথ গেমসে আশাদীপ শুটিং, কুস্তির সাফল্য

????

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিরন্দাজি, টেনিস না থাকায় আর শুটিং, কুস্তির বেশ কিছু বিভাগ বাদ যাওয়ায় গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদক সংখ্যা অনেক কমে গেছে। না হলে ২০০২-এ ম্যাঞ্চেস্টার কমনওয়েলথ গেমসে ৩০টি সোনা-সহ ষষ্ঠ পদকের খতিয়ানকে ছাপিয়ে যেতে পারত ভারত। বিদেশের মাটিতে যে কোনো আন্তর্জাতিক মাল্টিপল গেমসে এটাই ভারতের সবসেরা কৃতিত্ব। গতবার দিল্লী গেমসে ভারত দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার পরে থেকে। দেশের মাটিতে বলে এতটা উত্থান হয়েছিল অবশ্যই। না হলে ভারত ইদানীংকালে বারবারই কমনওয়েলথ গেমসে চার-পাঁচ নম্বরে থাকে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত পদক তালিকায় পঞ্চম স্থানেই আছে ভারত। শেষ পর্যন্ত হয়তো তাই দাঁড়াবে। তাই মোটের ওপর দেখলে এবারের কমনওয়েলথ গেমস ভারতের পক্ষে মোটামুটি আশাব্যঞ্জক বটে।

এবারের গেমস থেকে ভারতের প্রাপ্তি শুটিং, কুস্তির এক ঝাঁক নতুন মুখ। শুটিংয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় ২৬ বছরের নেপালি যুবক জিতুরাইয়ের। শুটিং সার্কিটে যার নাম 'পিস্তল কিং'। গ্লাসগোয় জোড়া গেমস রেকর্ড করে টার্গেটে নিখুঁত থেকে সোনা জিতেছেন ৫০ মিটার পিস্তল ইভেন্টে। ভারতীয় শুটিং বিশেষজ্ঞদের ধারণা জিতুর যা প্রতিভা তাতে ফোকাসটা ঠিক রেখে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় সহ পরিশ্রম করতে পারলে ২০১৬-র রিও অলিম্পিয়াড থেকে পদক এমনকী সোনাও নিয়ে আসতে পারেন। গ্লাসগোয় শুটিং থেকে ভারত ১৭টি পদক জিতেছে যা সর্বকালীন রেকর্ড। ঘরের মাটিতে অনুষ্ঠিত ২০১০ গেমসের তুলনায় দু'টি বেশি। আর এর পিছনে সিংহভাগ কৃতিত্ব জিতুর মতো আপাত অনামী ও অনভিজ্ঞদের উজ্জ্বল ভূমিকা।

গগন নারাংয়ের মতো বিশ্বখ্যাত শুটার এবার একটাও সোনা জিততে পারেননি। এই ব্যাপারটা যতটা না হতাশাজনক ততটাই আলোকোজ্জ্বল অপূর্বী চাণ্ডেলা, শ্রেয়সী সিংহ এবং অবশ্যই প্রকাশ নাঞ্জাপ্পার পারফরমেন্স। অপূর্বী এয়ার রাইফেল (১০ মিটার) ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে অনেক ভাল স্কোর করে সোনা জয় করেছেন। আর এক মহিলা শুটার রাহি সরনোবত এয়ার পিস্তলে সমতুল্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দু'জনের ভবিষ্যৎই

শুটার অয়নিকা পাল এবং অপূর্বী চাণ্ডেল।

উজ্জ্বল বলে মনে করেন বঙ্গগৌরব জয়দীপ কর্মকার। জয়দীপ লন্ডন অলিম্পিয়াডে চতুর্থ স্থান পেয়েছিলেন। এবার গ্লাসগো কিন্তু তাকে হতাশই করেছে। এই ব্যর্থতা তাঁর রিও অলিম্পিয়াড প্রস্তুতিতে এক বড় ধাক্কা নিঃসন্দেহে। তবে অভিজ্ঞ অভিনব বিন্দ্রা কিন্তু অধরা কমনওয়েলথ গেমস সোনাটি তুলে নিয়েছেন নিজের প্রিয় ইভেন্ট থেকে। অলিম্পিক সোনাজয়ী অভিনব সামনে থেকে ভারতীয় শুটিংকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং জুনিয়রদের তাতিয়ে সেরা পারফরমেন্স বের করে নিয়ে এসেছেন। তাইতো প্রকাশ নাঞ্জাপ্পা শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে ব্যারি ব্যাডন শুটিং রেঞ্জে পোডিয়াম ফিনিস করতে পারেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মুখটাই বিকৃত হয়ে যায় এবং মুখের ডান দিক অবশ হওয়ার দরুন শুটিং ছাড়তে বাধ্য হন। এক বছর আগে তার পক্ষে যে এভাবে ফিরে আসা সম্ভব তা দূরতম কল্পনাতেও আনা সম্ভব নয়। প্রকাশের রূপো জয় ভারতের শুটিং ইতিহাসে বিশেষ মাত্রাবৃত্তও বটে। দুই বাঙালি কন্যা শ্রেয়সী সিংহ, অয়নিকা পাল রূপো জিতে কীর্তিময়ী পূর্বসূরি সোমা দত্তের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। উন্নত পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে বিদেশী কোচের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুফল পাচ্ছেন তাঁদের মতো সব বিভাগের শুটাররা।

কুস্তিতেও ভারতের যে চিরাচরিত ঐতিহ্য রয়েছে বড় বড় আন্তর্জাতিক আসর থেকে ঝুড়িঝুড়ি পদক তুলে আনার, তার এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। অভিজ্ঞ সুশীল কুমার বা যোগেশ্বর দত্ত যে সোনা জিতবেন তা প্রত্যাশিতই ছিল। সুশীলের কৃতিত্ব একটু বেশি এইজন্য যে এবার ওজন বাড়িয়ে ৭৪ কিলো বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং আত্মপ্রত্যয় ও উন্নত টেকনিক দিয়ে সব প্রতিপক্ষকে জমি ধরিয়ে দিয়েছেন। যোগেশ্বর দত্ত গত অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী। কমনওয়েলথে সোনা জেতা তাই স্বতঃসিদ্ধ এক বাস্তব। কিন্তু অমিত কুমার, ববিতা, বিনেশরা যেভাবে ভিওয়ানীর আখড়া থেকে শেষ প্যাঁচপয়জারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন জবরদস্ত সব প্রতিপক্ষকে, তারপর বলতেই হয় এই মুহূর্তে কুস্তিতে ভারত বিশ্বমঞ্চে এক সমীহ জাগানো শক্তি। বিনেশ, ববিতা, গীতা কুমারীরা ভারতের মহিলা কুস্তিতে অনন্যমাত্রা প্রদান করেছেন। আসন্ন এশিয়াডেও এদের কাছে পদক প্রত্যাশী ভারতবাসী।

সুশীল কুমার ভারতীয় কুস্তিতে এক বিপ্লব এনেছেন। পরপর দু'বার অলিম্পিক থেকে পদক এনে দিয়েছেন দেশকে। ব্যক্তিগত স্তরে এই কৃতিত্ব কোনো ভারতীয় ক্রীড়াবিদের নেই। সুশীলের নেতৃত্বে ভারতীয় কুস্তিদল গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের ম্যাটে ঝড় তুলে দিয়েছিলেন প্রতিটি লড়াইয়ে। যার ফল পাওয়া যাবে পরবর্তী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ও অলিম্পিয়াডে রিও গেমসে। এখন থেকেই যদি ত্রিস্তরীয় পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা যায় তবে শুটিং-কুস্তি থেকে অন্তত ৭/৮টি পদক আসা অসম্ভব কিছু নয়। অলিম্পিক গোল্ড কোয়েস্ট ও লক্ষ্মী-মিত্তল ফাউন্ডেশন দেশের ক্রীড়ামানকে উন্নত করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকবছর ধরে কাজ করছে। এই দুই সংস্থাই শুটিং কুস্তিকে আরো বৃহৎ বিশ্ব মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে মনে করা হয়।

শব্দরূপ-৭১৮ শৌনক রায়চৌধুরী

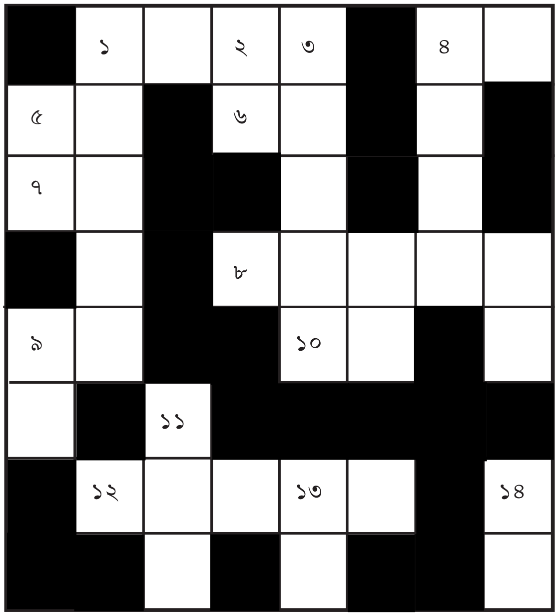

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. একই নামে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এক উপন্যাস ও এক বাঙালি সাহিত্যিক, **৪.** মক্ষিকা, **৫.** — বাতা ঋতায়তে, **৬.** হাতি ঘোড়া গেল—, মশা বলে কত জল, **৭.** দেবী লক্ষ্মী, **৮.** — কাশীবাস, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প, **৯.** তির, **১০.** রাশিচক্রের এক রাশি, **১২.** 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের এক চরিত্র।

উপর-নীচ : ১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প, **২.** সাদা, **৩.** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প, **৪.** বিখ্যাত নাটক,—গার্লস স্কুল, **৫.** নশ্বর, **৯.** কঠিন, **১১.** খেজুর, **১৩.** শক্তি, **১৪.** কামদেবের স্ত্রী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭১৫
সঠিক উত্তরদাতা
সৌরভ চক্রবর্তী
হালিশহর
নিরুপম ঝা
গাজোল, মালদা

গো			ম	ন্দো	দ	রী	
ধ			ক		ন্ত		
ন	ম	স্কা	র		ক	ব	ন্ধ
	স্ব					দ্ধ	
	ন্ত					জী	
ভা	র	বি		অ	তি	ব	লা
		ট		ন্ত			ব
	ক	প	র্দ	ক			ণ্যে

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৭১৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৫ আগস্ট, ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

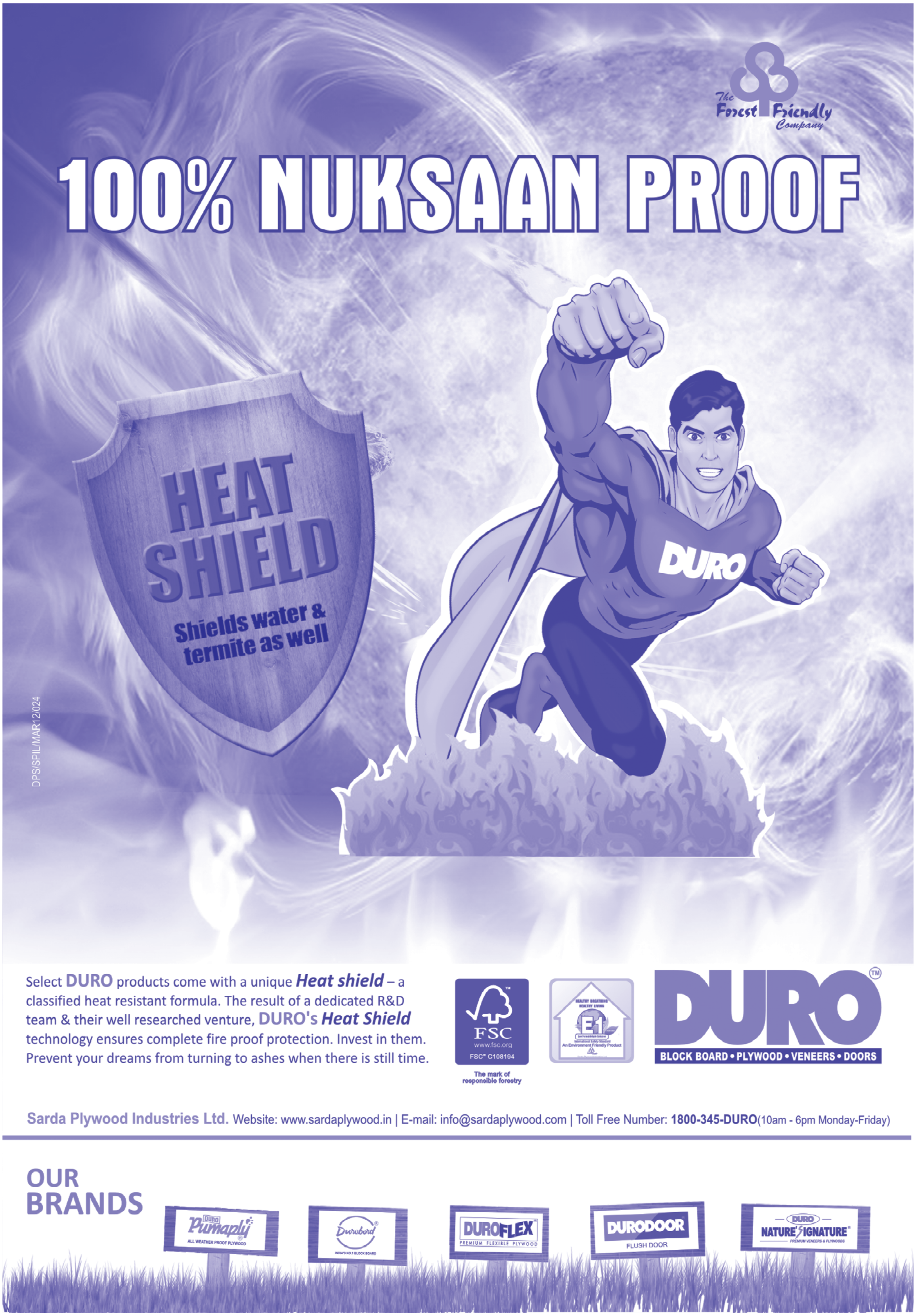
The Forest Friendly Company
100% NUKSAAN PROOF
HEAT SHIELD
Shields water & termite as well
DURO
DPS/SPIL/MAR12/024
Select DURO products come with a unique Heat shield – a classified heat resistant formula. The result of a dedicated R&D team & their well researched venture, DURO's Heat Shield technology ensures complete fire proof protection. Invest in them. Prevent your dreams from turning to ashes when there is still time.
FSC
www.fsc.org
FSC® C108194
The mark of responsible forestry
E1
An Environment Friendly Product
DURO
BLOCK BOARD • PLYWOOD • VENEERS • DOORS
Sarda Plywood Industries Ltd. Website: www.sardaplywood.in | E-mail: info@sardaplywood.com | Toll Free Number: 1800-345-DURO(10am - 6pm Monday-Friday)
OUR BRANDS
Pumaply
ALL WEATHER PROOF PLYWOOD
Duroboard
DUROFLEX
PREMIUM FLEXIBLE PLYWOOD
DURODOOR
FLUSH DOOR
DURO
NATURE SIGNATURE
PREMIUM VENEERS & PLYWOODS

জাতীয় ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে পরম্পরার অনুবর্তন

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা : ১৪২১

উপন্যাস

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় • শেখর সেনগুপ্ত • সুমিত্রা ঘোষ

প্রবন্ধ

স্বামী অরুণানন্দ, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, দেবীপ্রসাদ রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন সেন, তাপস অধিকারী, তথাগত রায়, সবুজকলি সেন, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

গল্প

রমানাথ রায়, শেখর বসু, গোপালকৃষ্ণ রায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র দাশগুপ্ত, জিষ্ণু বসু, চণ্ডী লাহিড়ী প্রমুখ।

এছাড়াও অন্যান্য রচনায় সমৃদ্ধ।

সবমিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো
একটি সংরক্ষণযোগ্য পূজা সংখ্যা

সত্বর কপি বুক করুন।

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৭০ টাকা।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
11 August - 2014

দাম : ১০.০০ টাকা